নিবেদিতা : প্রজ্ঞাপারমিতা

(ভগিনী নিবেদিতার কবিতা ও তাঁর উদ্দেশে
কবিদের শ্রদ্ধাঞ্জলি)

শরৎ পাবলিশিং হাউস
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৬৭
প্রকাশক
সত্যেন্দ্র চ্যাটার্জি
মুদ্রাকর
শ্রীসরোজকুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২ বিনোদ সাহা লেন
কলকাতা-৭০০০০৬
প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী
বাঁধাই
ক্যাপা বাইণ্ডার্স

উৎসর্গ

ভগবান বুদ্ধের চরণতলে

প্রকাশকের কথা

ভগিনী নিবেদিতার উদ্দেশে কবিতার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি আমরা ভক্তি-অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদনে ব্রতী হয়েছি। আশা করি পাঠকবৃন্দের আগ্রহ এ সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণকে ত্বরান্বিত করবে। তখন আরো ব্যাপকভাবে বাংলা ও বাংলার বাইরের বিভিন্ন কবির রচনা সংকলন করে আমরা কৃতার্থ হ'ব। সহৃদয় পাঠকবৃন্দের কাছে আবেদন, আপনারা সুচিন্তিত মতামত দিয়ে আমাদের এ প্রয়াসকে সফল করে তুলবেন।

বিনীত নমস্কারান্তে

প্রকাশক।

নিবেদন

নিবেদিতা-শতবার্ষিকীর পুণ্যলগ্নে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে জাতির শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের সঙ্কল্প নিয়ে এ সংকলনের সূচনা। তারপর প্রকাশের অপেক্ষায় দীর্ঘ তপস্যা। যখন এ সংকলন আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে, তখন পুরানো পাণ্ডুলিপি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে মনে হলো, নিছক মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে লেখা নয় বলে এ সংকলনে বিধৃত নিবেদিতার কবিতা বা নিবেদিতা সম্বন্ধে লেখা কবিতাগুলির মূল্য দিনে দিনে আরো বেড়েছে মাত্র।

নিবেদিতার জীবন ও বাণী স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানলব্ধ একটি মহাকাব্য। সে মহাকাব্যের মূল বিষয়বস্তু ভারতবর্ষ। তাই নিবেদিতাকে স্মরণ করার অর্থ স্বামীজীকে স্মরণ করা, তার মানেই ভারতবর্ষকে স্পর্শ করা, অন্তরে অনুভব করা।

এ সংকলনের 'নিবেদিতা'-অংশে নিবেদিতার কবিতা। নিবেদিতার তিনটি গ্রন্থ থেকে তাঁর কবিতাগুচ্ছ নির্বাচিত—'কালী দি মাদার'; 'অ্যান ইণ্ডিয়ান স্টাডি অফ লাভ অ্যাণ্ড ডেথ' এবং 'দি ফুটফলস্ অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি।'

আর নিবেদিতার উদ্দেশে স্বামী বিবেকানন্দ থেকে আরম্ভ করে একালের তরুণতম কবিরা যে সব কবিতা লিখেছেন তা রইল সংকলনের দ্বিতীয়ার্ধে 'প্রজ্ঞাপারমিতা'-অংশে।

দুয়ে মিলে 'নিবেদিতা : প্রজ্ঞাপারমিতা'।

এ গ্রন্থ উৎসর্গিত ভগবান বুদ্ধের চরণতলে। নিবেদিতার উপলব্ধিতে বিবেকানন্দ ভগবান বুদ্ধেরই আর এক আবির্ভাব।

—সম্পাদক

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষের

অন্যান্য গ্রন্থাবলী—

বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য

ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য (১ম খণ্ড)

নিবেদিতা : প্রজ্ঞাপারমিতা

ভূমিকা

মহত্ত্বের উপলব্ধি আর-এক মহৎ-হৃদয়ের অনুভবসাপেক্ষ। সে অনুভব অন্য সবার হৃদয়ে সঞ্চার করতে পারাও আপন মহিমারই নিশ্চিত প্রমাণ। মনুষ্যত্বের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল ব্যক্তিমাত্রেরই এই বৈশিষ্ট্য —যা শ্রেষ্ঠতম, তাকে চিনতে পারা, তার দ্বারা নিজে আলোকিত হওয়া, সে-আলোকে নিখিল মানবপ্রাণকে উদ্ভাসিত করা।

শ্রদ্ধার এই শক্তি উপনিষদের নচিকেতার মতো আপন আত্ম-বিশ্বাসের অটল নির্ভরভূমিতে দাঁড়িয়ে পরম জিজ্ঞাসার আলোকে সত্যকে যাচাই করে নেয়। তখনই প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা ঘটে। বিচিত্র পন্থায় এই সত্যানুসন্ধানের দ্বারা বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস গড়ে উঠেছে। সে ইতিহাসের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—দুটি প্রান্ত, আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ড—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মিলিত হয়েছিল।

সে মিলনের প্রথম পর্বে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের পট-ভূমিকায় এক সুপ্রাচীন অভিজাত ঐতিহ্যের সম্মুখীন বিস্ময়াহত বিদেশীর সভ্যতাগর্ব অচিন্তনীয়। অবাধ শোষণের সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধও তখন ইংরেজদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ছিলাম আমরাই প্রথম, তাই অন্ধ অনুকরণের আবর্তে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শিক্ষিতসমাজ প্রধানতঃ ঋণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো ব্যতিক্রম সে যুগে ছিল। তবু অনুকরণের যুগ পেরিয়ে আত্মস্থ স্বীকরণের যুগ দেখা দিল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। জাতি ধর্ম সাহিত্য সমাজ—সর্বত্রব্যাপ্ত যে স্বদেশপ্রাণতা এ যুগের

মূলপ্রেরণা, তারই প্রতীকরূপে দেখা দিলেন এক দিকে রবীন্দ্রনাথ, আর-এক দিকে স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের আবির্ভাবের মাত্র চার বৎসর পরে, ২৮শে অক্টোবর ১৮৬৭, ভগিনী নিবেদিতার জন্ম আয়ার্ল্যাণ্ডের নোব্‌ল্‌ পরিবারে। তাৎপর্যের দিক থেকে পৃথক হলেও একই ইংল্যাণ্ডের অধীনতাসূত্রে কাছের আয়ার্ল্যাণ্ড ও দূরের ভারতবর্ষের কোথাও একটু মিল ছিল। বিশ্বসংস্কৃতির আপাত বিপরীত যে দুটি প্রান্তের সমন্বয় বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সাধনায় প্রতিভাত, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে তা ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা।

রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ—ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ভারত-সংস্কৃতির যে বক্তব্য ইংল্যাণ্ড তথা য়ুরোপ-আমেরিকার মননশীলসমাজে তুলে ধরেছিলেন, নিবেদিতার মনস্বিতায় তার এক মিলিত ফলশ্রুতি ভারতের যথার্থস্বরূপ ও উপলব্ধির বাণী নিয়ে বিশ্বসভায় উপস্থাপিত। অবশ্য নিবেদিতার কাছে এই ভারতমন্ত্রের উদ্গাতা তাঁর আচার্য স্বামী বিবেকানন্দই প্রধানতম ও একতম। তবু নবীন ব্রাহ্মসমাজ ও প্রাচীন হিন্দুসমাজে মিলে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার যে পটভূমি সৃষ্টি করেছিল, নিবেদিতার জীবনে ও মননে তার মূল্য অপরিসীম।

ভারত-ইতিহাসের প্রতিটি পর্বে মানবচিন্তার বিপ্লব বা আমূল সংস্কারপ্রয়াস নানা ধর্মান্দোলনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিবেকানন্দের ভাষায়—'ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এদেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ। বারংবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এদেশে তাহা ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ।'—(বর্তমান ভারত)

ইতিহাসের এই শোভাযাত্রায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নাম আজ অবশ্য সংযোজনীয়। ভারতের জাতীয় বিপ্লব প্রথমে ধর্মের নামে

আত্মপ্রকাশ করে—বিবেকানন্দের এই প্রজ্ঞাদৃষ্টি নিবেদিতার ভারত-দর্শনের প্রধান সূত্র।

উত্তরকালে স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়ভ্রমণের সময় নিবেদিতা বিবেকানন্দমানসে রামমোহন রায়ের প্রভাব সম্বন্ধে শুনেছিলেন—"...we heard a long talk on Ram Mohun Roy, in which he pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussalman equally with the Hindu. In all these things, he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Ram Mohun Roy had mapped out."[১] আচার্য রামমোহনের চিন্তাধারার তিনটি মূলসূত্র—বেদান্তস্বীকৃতি, স্বদেশপ্রেমপ্রচার এবং হিন্দু-মুসলমানে সমান ভালোবাসা বিবেকানন্দের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

প্রথম যৌবনে তরুণ নরেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মসাধকবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের 'যোগীর চক্ষু' মহর্ষির দৃষ্টিতে উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তিনি বিধিবদ্ধ সভ্য ছিলেন। তবু ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গেই কলেজের শিক্ষাগুরু হেস্টিসাহেবের উল্লেখিত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পূজারী সমাধিমান শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহসান্নিধ্য লাভে তাঁর মানসপরিবর্তন ঘটতে থাকে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ; বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব; পুরাকালের ব্রহ্মজ্ঞানী এবং ইদানীংকালের ব্রহ্মজ্ঞানী, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা'

১ Notes of Some Wanderings With The Swami Vivekananda : Nivedita : Ch, II.

শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে বিবেকানন্দ-হৃদয়ে ঈশ্বরের নিশ্চিত অভিজ্ঞান তুলে ধরল। ভারতসংস্কৃতির সমন্বয়চেতনার আধুনিকতম প্রবক্তারূপেই বিশ্বসভায় তাঁর আত্মপ্রকাশ।

নিবেদিতার ভারতাত্মার অনুধ্যান রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও মননালোকে। স্বভাবতই ভারতের চিরন্তন গ্রহণশক্তির প্রমাণ তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের পারস্পরিক প্রভাবে, মুসলমান রাজশক্তির ছত্রতলে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভারত-চেতনায় এবং বিশেষ করে সম্পূর্ণ বিদেশী ইংরেজ আমলে শ্রীরামকৃষ্ণের সকল পথ ও মতের পরমলক্ষ্যগত ঐক্যসাধনায় অনুভব করেছেন—"...the personality that the nineteenth century has revealed as the turning point of the national development is that of Ramakrishna paramahamsa,[২] whose name stands as another word for the synthesis of all possible ideas and all possible shades of thought. In this great life, Hinduism finds the philosophy of Sankaracharya clothed upon with flesh, and is made finally aware of the entire sufficiency of any single creed or conception to lead the soul to God as its true goal. Henceforth, it is not true that each form of life or worship is tolerated or understood by the Hindu mind, each form is justified, set up for its passionate loving, for evermore.... At last, then, Indian thought stands revealed in its entirety—no sect, but a

২ এইখানে নিবেদিতার নিজস্ব পাদটীকা—Ramakrishna Paramahamsa lived in a temple-garden outside Calcutta from 1853 to 1886. His teachings have already become a great intellectual force.

synthesis ; no church but a university of spiritual culture—as an idea of individual freedom, amongst the most complete that world knows."[৩]

'জাতীয় প্রগতির ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী রামকৃষ্ণ পরমহংসের মাধ্যমে এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল ; এই নামটি যাবতীয় সম্ভাব্য আদর্শ ও সমস্ত ধরনের চিন্তাধারার সমন্বয়ের প্রতীক। হিন্দুধর্ম এই মহাজীবনে শাঙ্করদর্শনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি প্রত্যক্ষ করেছে, আর সেইসঙ্গে, যে কোনো একটি আদর্শ বা পন্থাই যে আত্মার ঈশ্বরোপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট, সেই সত্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। এর পর থেকে হিন্দুধর্ম শুধু অপর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুই রইল না, সকল পন্থাকেই সঙ্গত জেনে গভীরতর প্রীতির সঙ্গে স্বাগত জানাল। সম্প্রদায় নয় সমন্বয় ; বিশেষ কোনো উপাসনামন্দির নয়, বরং অধ্যাত্মসংস্কৃতির এক বিশ্ববিদ্যালয় ; বিশ্ব-ইতিহাসে পূর্ণতম ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকাশরূপে ভারতীয় মননধারা অবশেষে আপন সমগ্রতায় প্রকাশিত হল।'

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার বিশ্বজনীনতা নিবেদিতার দৃষ্টিতে আধুনিক পৃথিবীর দ্বন্দ্বজটিল পরিবেশে মানবজাতির অন্তর্নিহিত ঐক্যসন্ধানে পরমসহায়করূপে প্রতিভাত হয়েছে। বিবেকানন্দের চিকাগো-বক্তৃতা এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যই জগতের প্রতি ভারতের বাণী—'একম্ সৎ' ; সত্য এক। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম-প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নিবেদিতার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—It must never be forgotten that it was the Swami Vivekananda who, while proclaiming the sovereignty of the Advaita philosophy as including that

৩. *The Web of Indian Life* : The Synthesis of Indian Thought অধ্যায়।

experience in which all is one without a second, also added to Hinduism the doctrine that Dvaita, Vishistadvaita, and Advaita are but three phases or stages in a single development, of which the last name constitutes the goal. This is part and parcel of the still great and more simple doctrine that the many and the one are the same Reality, perceived by the mind at different times and in different attitudes or as Shri Ramkrishna expressed the same thing, "God is both with form and without form. And He is that which includes both form and formlessness."

(এ কথা কখনোই ভুললে চলবে না যে, এক অদ্বয়সত্তার প্রবক্তা অদ্বৈতদর্শনের চূড়ান্ত অধিকার ঘোষণা করেও স্বামী বিবেকানন্দই হিন্দুধর্মে এই উপলব্ধিটুকু যোগ করে দিয়েছেন যে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত একটি ক্রমবিকাশেরই তিনটি বিভিন্ন স্তর মাত্র—এদের মধ্যে শেষোক্ত অদ্বৈতই চরম লক্ষ্যস্থল। পূর্বোক্ত কথাগুলি আসলে—বহু এবং এক যে একই সত্তা, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উপলব্ধ একই সত্য—এই মহত্তর ও সরলতর ধর্মচেতনারই অঙ্গস্বরূপ। অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, "ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার। তাঁর মধ্যে সাকার ও নিরাকার দুইই রয়েছে।")

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতের সোপানপরম্পরায় ভারতের অধ্যাত্মসংস্কৃতি সাধারণতম মানুষ থেকে উচ্চতম প্রজ্ঞার অধিকারী সর্বশ্রেণীর মানব-ভাবনাকেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার মাধ্যমে আশ্রয় দিয়েছে। ধর্ম বা দর্শন এখন মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর করতলগত না থেকে জীবনের সমগ্র প্রকাশকেই অবলম্বন করেছে। যে বেদান্তচর্চা শুধু সাধকসমাজেরই চিন্তনীয় বিষয় ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণায় বিবেকানন্দ সে বেদান্তকে মুচি, মেথর, জেলে, চাষী, ছাত্র,

অধ্যাপক, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—সকল পথ ও মতের মানুষের আত্মোপলব্ধির সহায়ক করে তুলেছেন।

নিবেদিতার মতে এইখানে বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের, অতীত ও ভবিষ্যতের সমন্বয়তীর্থ হয়ে উঠেছেন। বহু ও এক যদি একই পরমসত্য হয়ে থাকে, তাহলে শুধুমাত্র উপাসনাই নয়, সব ধরনের কর্মপদ্ধতি, সমস্ত রকমের সংগ্রাম, যাবতীয় সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। "To him there is no difference between service of man and worship of God, between manliness and faith, between true righteousness and spirituality." (তাঁর [বিবেকানন্দের] কাছে মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায়, পৌরুষে ও বিশ্বাসে, সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় কোনো পার্থক্য নেই।)

গুরুর এ আদর্শ তাঁর মানসকন্যার মননে ও জীবনে পরিপূর্ণ রূপায়িত হয়েছিল সন্দেহ নেই। বিবেকানন্দের মতোই নিবেদিতার জীবনেও জ্ঞান ও ভক্তি তাঁর বিপুল কর্মযোগের প্রেরণা ও পরিপূরক।

বিবেকানন্দের রচনাবলীর ভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতা তাঁর গুরুর আর-একটি বাণী বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন—"Art, science, and religion are but three different ways of expressing a single truth. But in order to understand this we must have the theory of Advaita." পরম সত্যের উপাসিকা তাঁর অনুপ্রাণনায় কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাধক, দেশপ্রেমিক, সন্ন্যাসী—সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে কি সেই সত্যই প্রমাণ করে যান নি?

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর আনুষ্ঠানিক সম্পর্কচ্ছেদের পর আত্মপরিচয় রূপে তিনি লিখতেন Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা)।[৪] সন্দেহ নেই

৪ স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ অনুযায়ী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ রাজনৈতিক কর্ম-

এই পরিচয়ই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়। সে পরিচয়ের এক দিকে পাঁচ হাজার বৎসরের ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার ঘনীভূত উপলব্ধি, আর-এক দিকে বিশ্বকল্যাণে আত্মোৎসর্গের ত্যাগসুন্দর আদর্শ। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—ভারতীয় সন্ন্যাসের এ আদর্শকে ব্রহ্মচারিণী (Sister কথাটির মূল তাৎপর্য তাই) নিবেদিতা তাঁর গুরু ও পরমগুরু বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের পন্থানুসরণে সম্পূর্ণ 'জগদ্ধিতায়' —জগৎকল্যাণের সাধনায় রূপান্তরিত করেছিলেন। আপন মুক্তির জন্য ব্যাকুল না হয়ে বিশাল বটের মতো বিশ্বমানবকে ছায়াদানের ব্রতে বিরেকানন্দকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। 'দয়া নয়, 'সেবা'। বিবেকানন্দ সেই 'সেবা'কেই বলেছেন 'পূজা'। আর এই মহাপূজার অর্ঘ্যস্বরূপ তিনি ভারত ও সমগ্র জগতের কাছে তাঁর 'নিবেদিতা'কে উৎসর্গ করেছিলেন। বেলুড় মঠে (তখন মঠ নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়িতে) মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌লের 'নিবেদিতা'-রূপান্তরের মুহূর্তে বিবেকানন্দ তাঁর হৃদয়ে ভগবান বুদ্ধের আদর্শটি চিরপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—"যাও সেই বুদ্ধকে অনুসরণ করো—বুদ্ধত্বলাভের আগে যিনি পাঁচ শো বার অন্যের জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রাণ আহুতি দিয়েছিলেন!" নিবেদিতার কাছে সেই দিনের সকালটি 'জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় প্রভাত'।[৫] এক জনমে তাঁর 'জন্ম-জন্মান্তর' ঘটে গেল।

ধারা সম্পূর্ণ পরিহার করেছিলেন। অপর পক্ষে ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে রাজনৈতিক সংস্রব ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। তাই বাহ্যতঃ এই বিচ্ছেদের প্রয়োজন। কিন্তু নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ অব্যাহত ছিল। তাঁর বিদ্যালয় পরিচালনায় যেমন সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষের সহায়তা সদাজাগ্রত ছিল, তেমনি বিবেকানন্দ-জীবনী ও রচনাবলী সম্পাদনায় সঙ্ঘের মায়াবতী কেন্দ্রে থেকে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ একটি কাজ সম্পন্ন করেছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দময় তাঁর জীবনে এ বিচ্ছেদ একান্ত বহিরঙ্গ।

৫ ২৫ শে মার্চ, ১৮৯৮

ভারতীয় গুরুবাদের দর্শন পূর্ব পূর্ব মহামানবদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরোপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিচ ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারার নানা অবক্ষয়ের মতো গুরুবাদেরও ব্যবসায়িক বিকার নানা কারণে ঘটেছে, তবু জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের যে মূল্য, অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে সে মূল্য আরও বহুগুণ বেশি। অন্ততঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতার গুরুপরম্পরা ভারতীয় গুরুবাদের মহনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের সবচেয়ে আশ্বস্ত করে। আপন গুরুর কাছে নিবেদিতা যে ইষ্টমন্ত্র লাভ করেছিলেন, তার শরীরীসত্তা সমগ্র ভারতবর্ষ। নিবেদিতার ধ্যানদৃষ্টি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের সর্বত্র আপন অভীষ্টের অনুসন্ধান করে ফিরেছে এবং তাঁর সেই অনুসন্ধানের ব্যাকুলতা ও ভক্তি নিবেদিতা-সাহিত্যের মূল অবলম্বন।

ভারতবর্ষকে ভালোবাসার যে আনন্দ তিনি বিবেকানন্দমানসে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সে ভালোবাসা জাতীয় গৌরব ও বেদনাবোধের অংশীদার হলেও আসলে তা বিশ্বমানবের কল্যাণে উৎসর্গিত ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনার বাণী। বৈদিক যুগের উষাকাল থেকে যে অমৃত ভারতবর্ষ আপন হৃদয়ে ও মনীষায় অনুভব করেছে, বিশ্ববাসীকে তার অংশভাগী করার জন্য ভারতের ব্যাকুলতা বেদ, উপনিষদ, এবং বুদ্ধ শংকর রামানুজ নানক চৈতন্য রামকৃষ্ণ প্রমুখ সাধকবৃন্দের মাধ্যমে বারংবার উচ্চারিত। ভারতবর্ষের এই নিজস্ব বাণী বর্তমান মানবসভ্যতার সঞ্জীবনীমন্ত্রস্বরূপ। বিশ্বসভ্যতার ধাত্রী এই ভারতবর্ষকে উপলব্ধির প্রয়োজন পাশ্চাত্যের প্রশ্নমুখর বর্তমানের পক্ষেই সবচেয়ে বেশি।

প্রতীচ্যের পক্ষ থেকে নিবেদিতার অসাধারণ মনীষা সেই উপলব্ধির ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে এসেছিল বলেই ভারতবর্ষও নিজেকে অনেক পরিমাণে চিনতে শিখেছে। আমাদের আজকের ভারত-অনুধ্যান জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁরই আত্মনিবেদনে অনেকখানি অনুপ্রাণিত।

বিদেশিনী নোব্‌লের পক্ষে ভারতোপলব্ধির সাধনায় এই

অসাধারণ সিদ্ধি তাঁর স্বকীয় অসাধারণত্বের পরিচায়ক হলেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাধারাই এ বিষয়ে তাঁর পথনির্দেশ করেছে। প্রসঙ্গত একটি বিশেষ দিনের বিবেকানন্দ-নিবেদিতার আলাপচারি স্মরণীয়। জোড়াসাঁকোয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে নিবেদিতার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দও চলেছেন। যাবার আগে স্বামীজী নিবেদিতাকে একটি মৃত্যুদৃশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, পূর্বদিন এই মৃত্যু-ঘটনায় নিবেদিতা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ওই ঘটনার পটভূমিকায় নিবেদিতার মনে এক নিগূঢ় সত্যের উদ্ভাসন ঘটেছিল—"religions are only languages and we must speak to a man in his own language."[৬] (ধর্মসম্প্রদায়গুলি শুধু বিভিন্ন ভাষা মাত্র, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে আমাদের তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে হবে।) কথাটি শোনা মাত্র বিবেকানন্দের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, বললেন, "হ্যাঁ। আর শ্রীরামকৃষ্ণই শুধু সেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। একমাত্র তাঁরই এ কথা বলার সাহস ছিল যে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে হবে।"[৭]

নিবেদিতার চিন্তা ও বিবেকানন্দের সমর্থন প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র উপদেশ নয়, প্রধানতঃ ধর্মজীবন যাপনের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন সমন্বয়ধর্মের আদর্শ তাঁর মানসকন্যার অন্তরে সঞ্চার করে চলেছিলেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর হিমালয়-ভ্রমণ ও য়ুরোপ-যাত্রার স্মৃতি এ দিক থেকে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁর শিক্ষয়িত্রী জীবনের সাধনায় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতিটি খুঁটিনাটির প্রতিও কত সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন সে কথাও তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ। সুতরাং ভারতের প্রাণ-স্পন্দনস্বরূপ ধর্মচেতনার প্রতিটি স্তর সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধান ও স্বীকরণের সাধনার সূত্রপাত হল। "I set myself therefore to enter

৬, ৭ *The Master as I saw Him :* The Swami and Mother Worship অধ্যায়।

into Kali-worship, as one would set oneself to learn a new language, or take birth deliberately, perhaps in a new race."[৮] ('লোকে যেমন করে নতুন কোনো ভাষা শেখে, অথবা হয়তো স্বেচ্ছায় নতুন কোনো জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, ঠিক তেমনি ভাবে আমি এই কালী-উপাসনার গভীরে প্রবেশ করতে চাইলাম।')

মানবসভ্যতার এই নূতন অথচ চিরপুরাতন ভাষাটি আয়ত্ত করতে নিবেদিতা প্রতিদিনের অভ্যাসে ও ধারণায় অতীত জীবনধারার কত শত পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছেন, তবু বিরামহীন সংগ্রামে প্রতীচ্যের কাছে প্রাচ্যবাণী প্রচারের এই ব্রত তিনি আমরণ উদযাপন করেছেন। এর ফলে তাঁর সাহিত্যকৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক বিচারের একটি সার্থক নিদর্শনে পরিণত। সেই সঙ্গে ভারতীয় চিন্তা ও চর্যার ব্যাখ্যায় তাঁর নিজস্ব দানও স্মরণীয়। কারণ, গুরুর কাছে প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ভাষাটি আবিষ্কারের রহস্য তাঁর অধিগত ছিল। মানব-মনের সেই চাবিকাঠিটি ভারতীয় সাধনার ঐতিহ্যে নূতন আলোকপাতে সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ ভারতীয় ধ্যানধারণার শিব ও শক্তি কল্পনা সম্বন্ধে তাঁর অপূর্ব ব্যাখ্যা স্মরণীয়—As the Purusa, or Soul, He is Consort and Spouse of Maya, Nature, the fleeting diversity of sense. It is in this relation that we find Him beneath the feet of Kali, His recumbent posture signifises inertness, the Soul untouched and indifferent to the external. Kali has been executing a wild dance of carnage···. Suddenly She has stepped unwittingly on the body of Her Husband. Her foot is on His breast He has looked up awakened by that touch, and they are gazing into each other's eyes.

---

৮ তদেব

…Her mass of black hair flows behind Her like the wind, or like time, "the drift and pastage of things." But to the great third eye even time is one, and that one, God. She is blue almost to blackness, like a mighty shadow. Deep into the heart of the most Terrible, He looks unshrin king, and in the ecstasy of recognition, He alls Her Mother. So shall ever be the union of the soul with God."[১]

('পুরুষ বা আত্মারূপে তিনি প্রকৃতি বা মায়ার—ইন্দ্রিয়জগতের বিচিত্র প্রকাশলীলার সহচর, স্বামী। এই সম্বন্ধেই আমরা তাঁকে কালীর চরণতলে দেখতে পাই। তাঁর প্রশান্ত ভঙ্গিমাটি নিষ্ক্রিয়তার প্রতীক। আত্মা বহির্জগতের প্রতি উদাসীন, অসম্পৃক্ত। কালী এক ভয়ঙ্কর সংহারনৃত্যে মত্ত ছিলেন।…সহসা অতর্কিতে তিনি তাঁর স্বামীর বুকে পা রেখেছেন। সেই স্পর্শে সচকিত শিব কালীর দিকে চোখ মেলে চাইলেন, স্থিরনেত্রে দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে রইলেন।

…মায়ের পুঞ্জ কৃষ্ণ কেশরাশি ঝড়ের মতো পিছন দিকে উড়ে চলেছে, অথবা 'সমস্ত বস্তুপ্রবাহ বহনকারী' সময়ের মতো ছুটে চলেছে। কিন্তু পরম ত্রিনয়নের দৃষ্টিতে কালও এক, অখণ্ড, আর সেই একই ঈশ্বর। মায়ের নীলিমা ঘনকৃষ্ণের কাছাকাছি—এক বিশাল ছায়ার মতো। সেই মহা ভয়ঙ্করীর হৃদয়-গভীরে তিনি নির্নিমেষে চেয়ে আছেন। আর সেই উপলব্ধির সমাহিত আনন্দচেতনায় তিনি তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। আত্মা ও ঈশ্বরের এই তো চির-অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।')

নীলকণ্ঠের দিব্যদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত কালীর এই ধ্যানমূর্তি নিবেদিত-মানসে মানবজীবনের চিরন্তন বেদনাসত্যের প্রতীকে পরিণত—"After all, has anyone of us found God in any other

১ *Kali the Mother*: The Vision of Siva.

form than in this—the Vision of Siva? Have not the great intuitions of our life all come to us in moments when the cup was bitterest? Has it not always been with sobs of desolation that we have seen the Absolute triumphant in Love?"[১০] ('শেষ অবধি শিবের এই ধ্যানদৃষ্টিতে ছাড়া আর কোনো উপায়ে কি কেউ ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে? আমাদের জীবনের যত মহত্তম উপলব্ধি—তারা কি বেদনার পাত্রটি তিক্ততম রসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার মুহূর্তেই ধরা দেয় নি? সর্বরিক্ততার বুক-ভাঙা কান্নার মুহূর্তেই কি আমরা প্রেমের বিজয়ীমূর্তিতে পরমতমের দর্শন লাভ করি নি?')

কালী প্রতীকের এই ব্যাখ্যায় সহজেই বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে শ্যামা', 'Kali, the Mother' এবং 'Who knows How Mother Plays' কবিতা তিনটি মনে পড়ে। বিশেষতঃ দ্বিতীয় কবিতার শেষ ক'টি চরণ—

Who dares misery love,
And hug the form of Death,—
Dance in destruction's dance
To him the Mother comes.[১১]

সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।[১২]

তবু নীলকণ্ঠ শিবের দিব্যদর্শন-সমুদ্ভূত কালীকল্পনার ব্যাখ্যাটি নিবেদিতার একান্ত নিজস্ব। স্বামীজীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গেই একদিন নিবেদিতা প্রশ্ন করেছিলেন, "Perhaps, Swamiji, Kali is the Vision of Shiva! Is She?" ('স্বামীজী, কালী সম্ভবতঃ শিবের

১০ তদেব

১১ *In Search of God and other Poems* : Swami Vivekananda.

১২ 'মৃত্যুরূপা মাতা' : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনূদিত।

দিব্যদর্শন। তাই কি?') মুহূর্তের জন্য বিবেকানন্দ নিবেদিতার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "Well! Well! Express it in your own way. Express it in your own way." ('বেশ, বেশ, তোমার নিজের মতো করে প্রকাশ করো, তোমার নিজের মতো করে প্রকাশ করো।')[১৩] পরমসত্যের সাধনায় প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতা-স্বাতন্ত্র্য বিবেকানন্দ স্বীকার করতেন। নিবেদিতাকে এই স্বাধীন শিক্ষার দ্বারাই তিনি সবচেয়ে বেশি রূপান্তরিত করেছেন।

জগৎ ও জীবনের রহস্য-অনুসন্ধানে মানুষ বিভিন্ন দেশে ও কালে বিভিন্ন প্রতীক সৃষ্টি করেছে। পুরাতন লোকসংস্কৃতি, ব্রত-আচার-পার্বণ থেকে সেই প্রতীক রহস্যগুলি উপলব্ধি করতে না পারলে কোনো জাতির অন্তরঙ্গ ইতিহাস অনুধাবন করা যায় না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা ভারতের সেই প্রাণলোকের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন তাঁর *The Web of Indian Life, Footfalls of Indian History, Studies from an Eastern Home* এবং অন্যান্য গ্রন্থসমূহে। ভারতবর্ষের নিজস্ববাণী তাঁর কাছে ভারতের নানা প্রতীক-চেতনার মাধ্যমে ধরা দিয়েছে। *Kali the Mother* গ্রন্থে এই প্রতীক-বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় তাঁর আর্যদৃষ্টি স্মরণীয়—"Our daily life creates our symbol of God. No two ever cover quite the same conception···yet we know how the tongue of each people expresses some one group of ideas with especial clearness, and ignores others altogether. Never do we find an identical strength and weakness repeated and always if we go deep enough, we can discover in the circumstances and habits of a country, a cause for its specific difference of thought

১৩ *The Master As I Saw Him :* The Swami and Mother Worship.

or of expression."[১৪] ('দৈনন্দিন জীবন আমাদের ঈশ্বরের প্রতীক সৃষ্টি করে চলেছে। এই প্রতীকের নিহিতার্থ কখনো এক নয়।…তবু আমরা জানি, প্রত্যেকটি মানুষের ভাষাই কেমন করে বিশেষ এক ধরণের ভাবধারাকে প্রকাশ করে, অথচ অন্য জাতীয় ভাবধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়। একই ধরণের সবলতা বা দুর্বলতা কখনো পুনরাবৃত্ত হয় না। আর আমরা যদি আরো গভীরে সন্ধান করি, তাহলে বিশেষ কোনো ভাবনা বা প্রতীকের পটভূমিতে দেশবিদেশের পরিবেশ বা জীবনযাত্রার ধারাগুলি আবিষ্কার করতে পারি।')

কিন্তু এই 'দেশ-দেখা-চোখ' আমাদের আপন দেশেই বিরল, কোনো বিদেশী ধর্মপ্রচারকের কাছে তো প্রত্যাশার অতীত। ভারত-পরিক্রমার সময়ে নিবেদিতা ভারতের নিজস্ব পুরাণ ও প্রতীকগুলির অর্থ উপলব্ধির আলোকে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বুঝতে চেয়েছেন। স্বভাবতই অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত একটু দ্রুত, প্রবল প্রীতির আগ্রহে অযোগ্যকেও যোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট। কিন্তু যে শ্রদ্ধার আলো চোখে না থাকলে কোনো ইতিহাস-দর্শনই সত্য হয় না, নিবেদিতার দৃষ্টিতে সেই আলো সঞ্চারিত হয়েছিল বলেই জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের একটি অখণ্ড ভাবমূর্তি তাঁর রচনাবলীতে ফুটে উঠেছে।

নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতে যীশুখৃষ্টের আদর্শ আপনা থেকেই প্রচারিত হয়েছে, বিদেশী মিশনরিদের সে সম্বন্ধে ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে খৃষ্টধর্মপ্রচার যদি সম্ভব না হয়, তাহলে এ জাতীয় প্রচারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের বিমুখ-তাই স্বাভাবিক। বিদেশী মিশনরিদের উদ্দেশে ধর্মপ্রচারের যে আদর্শ তিনি উপস্থাপিত করেছেন, সে আদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তাঁরই জীবন। *Lambs Among Wolves* পুস্তিকাটিতে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য—"Let them love the country as if they had been born

১৪ *Kali the Mother :* প্রথম প্রবন্ধ 'Concerning Symbols.'

in it, with no other difference than the added nobility that a yearning desire to serve and save might give. Let them become loving interpreters of her thought and custom, revealers of her own ideals to herself even while they make them understood by others. When a man has the insight to find and to follow the hidden lines of race-intention for himself, others are bound to become his disciples, for they recognise in his teachings their own aspirations."

('এমন ভাবে তাঁরা [মিশনরিরা] এ দেশকে ভালোবাসতে শিখুন, যেন এ দেশই তাঁদের জন্মভূমি; আর কোনো পার্থক্য নয়, শুধুমাত্র সেবা ও ত্রাণের জন্য এক বিপুল আগ্রহের মহিমা তাঁদের থাকুক। এ দেশের চিন্তা ও চর্যাকে তাঁরা গভীর ভালোবাসার দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করুন, বাইরের পৃথিবীর কাছে সে ব্যাখ্যা যেন এই দেশবাসীর কাছেও তাদের আত্মপরিচয় উজ্জ্বলতর করে তোলে। কেউ যদি একটি জাতির অন্তরতম অভীপ্সার বাণী উপলব্ধি ও অনুসরণ করতে পারেন, তাহলে সে জাতির আর সবাই আপন আদর্শের মহত্তম প্রকাশ তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়ে তাঁর অনুগামী হতে বাধ্য।')

সংক্ষেপে এই হল ভগিনী নিবেদিতার জীবনবেদ।

বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা জাতীয় আত্মাভিমান যখন ধর্মপ্রচারের ছদ্মবেশে দেখা দেয় তখন নিবেদিতার ওই আদর্শ অসম্ভব ও অবাস্তব মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ কোনো মতবাদের দ্বারা বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করা নয়, মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করাই যাঁদের সাধনা, তাঁরাই নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতা উপলব্ধি করবেন।

জাতীয় সত্তার সঙ্গে এই একাত্মতার সাধনায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্তরসত্য তাঁর কাছে কতখানি ধরা দিয়েছিল তার অসংখ্য

উদাহরণের একটি মাত্র প্রথমে পাঠকসমাজের সামনে উপস্থিত করা যেতে পারে। বৌদ্ধযুগের অবসানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ের যুগে ভারতবর্ষে শিব মুখ্য দেবতাদের অন্যতম হয়ে দাঁড়ালেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিবেদিতা তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন—"In tracing out the evolution of the Shiva image, we are compelled to assume its origin in the Stupa. And similarly, in the gradual concretising of the Vedic Rudra into the modern Mahadeva, the impress made by Buddha on the national imagination is extraordinatily evident."[১৫] ('আমাদের ধারণা শিব-প্রতীকের বিবর্তন অনুসরণ করলে [বৌদ্ধ] স্তূপ থেকে এর উৎপত্তির ধারণা অবশ্য স্বীকার্য। ঠিক তেমনি বৈদিক রুদ্রের আধুনিক মহাদেবে ক্রমরূপান্তরে জাতীয় ধ্যানধারণায় বুদ্ধের প্রভাব অবশ্য লক্ষণীয়।')

শিব ও বুদ্ধ—উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে ভারতবাসীর এই দুই অন্তরতম দেবতার নবপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা—তিনজনেরই ধ্যান ও কল্পনায় নানাভাবে ঘুরে ফিরে শিব ও বুদ্ধপ্রসঙ্গ এসেছে। ভারতাত্মার অন্তরতম উপলব্ধির সন্ধানী এই ত্রয়ী তীর্থপথিকের রচনাবলীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এঁদের দেশপ্রেম ও ভগবৎপ্রেমের অপূর্ব সম্মেলনে। এঁদের কাছে ভারতবর্ষ শুধু স্বদেশ বা ভৌগোলিক সীমামাত্র নয়, নিখিল বিশ্বের অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির তীর্থভূমি।

ভারতীয় চিন্তাধারার বিবর্তনে শ্রীকৃষ্ণের দান সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। ভারত-সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয়লাভে উন্মুখ ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতেও আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের জাতীয় জীবনে মনুষ্যমহিমার পূর্ণাঙ্গ বিকাশে পুরাণ ও ইতিহাসের সমন্বিত প্রতীক, মহাভারত-নাট্যের সূত্রধার, ভারতীয়

১৫ *Footfalls of Indin History :* Buddhism and Hinduism

প্রজ্ঞার সংহত রূপায়ণ ভগবদ্‌গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের মহিমোজ্জ্বল প্রকাশ—'If we dip into its history we shall think it a strange medley. So many parts were never surely thrust upon a single figure। But through it all we note the predominant Indian characteristics—absolute detachment from personal ends, a certain subtle and humorous insight into human nature.[১৬] (শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস যদি আমরা গভীরভাবে অনুধাবন করি তাহলে এক বিচিত্রতম মিশ্রণ দেখতে পাব। এত অসংখ্য বৈশিষ্ট্য আর কোনোকালে একটিমাত্র ব্যক্তিত্বে আরোপিত হয় নি। কিন্তু এ-সব বৈচিত্র্যের অন্তরালে ভারতীয় চেতনার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এক অনাসক্তির আদর্শ এবং মানবচরিত্রের মর্মস্থলে প্রবেশের এক সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য লাভ করেছে।)

গীতা ও বাইবেল—শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুখৃষ্ট—মানব-অন্তরে পরমের অন্বেষণে তীর্থযাত্রায় এক অনন্তকরুণার সিন্ধুতীরে এসে দাঁড়িয়েছেন—The voice that speaks on the field of Kurukshetra is the same voice that reverberates through an English childhood from the shores of the Sea of Galilee. We read the gracious words, "Putting aside all doctrines, come here to me alone for shelter—I will liberate thee from all sins. do not then grieve. Fixing thy heart on Me. thou shalt by My grace, cross over all difficulties." and we drop the book, lost in a dream of one who cried to the weary and heavy-laden, "Come unto Me."[১৭]

যে শরণাগতি সকল দেশের ভগবৎ-সাধনার গোড়ার কথা,

১৬, ১৭ *The Web of Indian Life* : The Gospel of the Blessed One

নিবেদিতা-হৃদয়ে তা বৈষ্ণব ও খ্রীষ্টীয় সাধনাদর্শকে পরম ঐক্যে মিলিত করেছে। আসলে যীশুর আদর্শ ভারতীয় ভক্তিযোগের খুব কাছাকাছি বলেই নিবেদিতার পক্ষে ভারতীয় ভক্তিচেতনার উপলব্ধি এত সহজ হয়ে উঠেছে। বিজয়ী জাতির সহজাত অহংকার তাঁর মন থেকে নিঃশেষে মুছে গিয়ে তাঁর মধ্যে যে চিরন্তন মানুষটি জেগে উঠেছিল, ধর্ম সমাজ সম্প্রদায় ও জাতির বেড়া উত্তীর্ণ হয়ে তা সত্যের অমৃতরূপকে নিমেষে উপলব্ধি করেছে।

বাঙালী ঘরের সরস্বতীপূজা দেখে নিবেদিতার মনে হয়—'Man has had many dreams of Divine Wisdom, but surely few so touching as this Saraswati in Bengal.'[১৮] ('দিব্য-জ্ঞানের কত-না রূপমূর্তি মানুষের কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়েছে! তবু বাংলাদেশের সরস্বতীর মতো হৃদয়স্পর্শী কল্পনা একান্ত বিরল।')

দোলপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কথা স্মরণ করে তিনি ভাবেন—'There was a wonderful fitness in the fact that in the fulness of time it was on the full-moon of Phalgun, the day of the Holi festival, that Chaitanya, apostle of rapture, lover of the poor and lowly, the national saint and the preacher of democracy was born here in Bengal.'[১৯]

('পরমানন্দের মূর্তবিগ্রহ, সাম্যের প্রচারক, পতিত ও দরিদ্রের প্রেমিক, জাতীয় মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য যে দোলযাত্রার ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনটিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন—এ ঘটনার মধ্যে এক অপূর্ব নাটকীয় অনিবার্যতা নিহিত।')

রামায়ণ-মহাভারতে চিরস্পন্দমান ভারতহৃদয় তাঁর অনুভবে—What philosophy by itself could never have done for

১৮ *Studies from an Eastern Home :* The Saraswati Puja.

১৯ তদেব : Dol-Jatra.

the humble, what the laws of Manu have done only in some measures for the few, that the epics have done through unnumbered ages and are doing still for all classes alike. They are the perpetual Hinduisers, for they are the ideal embodiments of that conception of condvct, of which laws and theories can give but the briefest abstract, yet towards which the hope and effort of every Hindu child must be directed.[২০]

('দর্শন যা কখনো সাধারণ মানুষের জন্য করতে পারত না, মনুর অনুশাসন যা মুষ্টিমেয়োর জন্য সম্ভব করে তুলেছিল, অনন্তকাল ধরে এবং আজ অবধি এই মহাকাব্যদুটি সর্বশ্রেণীর মানবের জন্য তাই সাধন করে চলেছে। হিন্দুর ধ্যানধারণার তারা চিরন্তন প্রকাশ ভারতীয় জীবনাদর্শ ও আচার-আচরণের যে আদর্শ শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে সূত্রাকারে প্রকাশিত, এ দুই মহাকাব্যে তারই পরিপূর্ণ বাণীমূর্তি। প্রতিটি হিন্দু সন্তানের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার এরা নিয়ামক।')

ছাত্রদের ভারতীয়তাবোধের প্রথম পাঠরূপে রামায়ণ-মহাভারতের ঘনিষ্ঠ পরিচিতি তিনি একান্ত আবশ্যক মনে করতেন। শুধুমাত্র অতীত গৌরবের জন্যই নয়, সেবা ও সাধনার দ্বারা নবযুগের মহত্তর কীর্তিসৌধস্থাপনের স্বপ্নও তিনি এ দুই মহাকাব্যের দ্বারা তরুণপ্রাণে সঞ্চার করতেন। *Studies from An Eastern Home* গ্রন্থের ভূমিকায় স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক ও তাঁর গুণ-গ্রাহী বন্ধু শ্রীর্যাটক্লিফ এক তরুণসভায় রামায়ণ সম্বন্ধে নিবেদিতার বক্তৃতাংশ উল্লেখ করেছেন—'The Ramayana is not something that comes once for all from a society that is dead and gone ; it is something springing ever from the living heart of a people. Our word to the young

২০ *The Web of Indian Life :* The Indian Sagas.

Indian today is : Make your own Ramayana, not in written stories, but in service and achievement for the motherland.

('রামায়ণ শুধুমাত্র এক বিগত মৃত সভ্যতার অতীত কাহিনী নয়। এক জীবন্ত জাতির প্রতিদিনের জীবন থেকে এই রামায়ণ উৎসারিত হয়ে চলেছে। আজকের তরুণ ভারতের কাছে আমাদের বক্তব্য, শুধুমাত্র লিখিত কাহিনীতে নয়, সেবা ও সাধনায় নিজেদের রামায়ণ তোমরা নিজেরা সৃষ্টি করে তোলো।')

কিন্তু শুধুমাত্র শাস্ত্র, শিল্প বা সাহিত্য নয়, নিবেদিতার কাছে ভারতের মহিমার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ছিল এ দেশের দরিদ্র নিরক্ষর সরল অথচ গভীরতন জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত নরনারী। সন্দেহ নেই, সাধারণের মধ্যে এই অসাধারণকে প্রত্যক্ষ করার প্রেরণামন্ত্রও বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী থেকেই সঞ্চারিত। তবু, মানুষকে গড়ে তোলা ও মানবমনের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করার সাধনায় তিনি যে তাঁর কর্মজীবনের প্রথম থেকেই শিক্ষয়িত্রীব্রত উদ্‌যাপন করেছেন, সে কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মানুষকে তিনি জীবনের সর্বস্তর থেকে আবিষ্কার ও প্রকাশ করতে পারতেন—এ তাঁর সহজাত প্রতিভা। উপযুক্ত গুরুর সান্নিধ্যে এসে সে প্রতিভা উজ্জ্বলতর হয়েছে।

জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী অবলা বসুর স্মৃতিচারণে লক্ষণীয়, নিবেদিতা তাঁর আলাপ-আলোচনায় কখনো 'Indian Women' (ভারতীয় নারী) বা 'Indian need' (ভারতের প্রয়োজন) বলতেন না, বলতেন, 'Our Women' (আমাদের মেয়েরা) বা 'Our need'[২১] (আমাদের প্রয়োজন)। জগদীশচন্দ্রের আগ্রহে লিখিত[২২]

২১ *Studies from An Eastern Home* : শ্রীর‍্যাটক্লিফের ভূমিকা 'In memoriam' থেকে। ২২ 'নিবেদিতা সম্বন্ধে প্রবাসীতে কিছু লেখবার জন্য জগদীশ আমাকে অনুরোধ করেছিলেন—আমি প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম'। [পত্রাবলী : রবীন্দ্রনাথ। শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত : শারদীয় 'দেশ' পত্রিকা ১৩৭৩]

রবীন্দ্রনাথের 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধটিতেও কবি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন, "তিনি যখন বলিতেন Our people (আমাদের জনগণ) তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না।"

শ্রদ্ধার দূরত্বে নয়, আত্মার আত্মীয়তায় নিবেদিতার মহত্ত্বের পরিমাপ। বৈষ্ণব কবিরা হয়তো একেই বলবেন 'রাগাত্মিকা ভক্তি'—জন্মজন্মান্তরের আত্মীয়তা।

শিক্ষা—বিশেষভাবে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন নিবেদিতার এ দেশে আসার প্রধান উপলক্ষ্য। কিন্তু এ দেশের যুগযুগান্তরের ভাবধারায় গঠিত আপাতদৃষ্টিতে নিরক্ষর অথচ গভীরতর অর্থে মহত্তম চিন্তার অধিকারিণী এমন এক নারীসমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে, যাঁদের কাছে তিনিই শিক্ষার্থিনী হয়ে দাঁড়ালেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদাদেবী, শ্রীরামকৃষ্ণ-মাতৃরূপা গোপালের মা, সাধিকা যোগীন মা, এঁদেরই মুখে পুরাণ-কাহিনী শুনে নিবেদিতার *Cradle Tales of Hinduism*-এর অমর কাহিনীগুচ্ছের সৃষ্টি। এইসব অন্তঃপুরচারিণীদের জীবনে, আচরণে, কথোপকথনে তিনি ভারতীয় নারীসমাজের যে অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করেন, তার দ্বারা ভারতীয় আদর্শে শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তোলার মূলভিত্তিটি সুদৃঢ় হয়েছিল। প্রাচ্যের আত্মবিলোপ ও পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—জননী ও সহধর্মিণী—এ দুটি ভাবেরই উপযোগিতা উপলব্ধির পটভূমিতে তিনি আধুনিক ভারতীয় নারীর জাগরণ কল্পনা করেছেন—When the women see themselves in their true place, as related to the soil on which they live, as related to the past out of which they have sprung; when they become aware of the needs of their own people, on the actual colossal scale of those needs; when the mother-heart has once awakened in them to beat for land and

people, instead of family, village and homestead alone and when the mind is set to explore facts in the service of that heart—then and then alone shall the future of Indian womanhood dawn upon the race in its actual greatness ; then shall a worthy education be realised ; and then shall then true national ideal stand revealed.[২৪]

(ভারতীয় নারী যখন তাদের নিজস্ব স্থানটি অধিকার করবে—যে দেশে তাদের জন্ম, যে অতীত থেকে তাদের আবির্ভাব, যে বিপুল জাতীয় জীবনের কর্তব্য তাদের সম্মুখীন—সে-সব কিছু সম্বন্ধে যখন তারা সচেতন হয়ে উঠবে, শুধুমাত্র আপন আপন বাড়িঘর, গ্রাম ও পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে যখন সমস্ত দেশ ও জনসাধারণের জন্য তাদের মাতৃহৃদয় স্পন্দিত হবে, আর সে হৃদয়ের অনুভব কর্মে পরিণত করার মানসিকতা তাদের মধ্যে দেখা দেবে—একমাত্র তখনই ভারতীয় নারীর মহিমাময় ভবিষ্যৎ এ জাতির জীবনে প্রতিভাত হবে, এক মহান শিক্ষাদর্শের প্রত্যক্ষ রূপায়ণ ঘটবে, যথার্থ জাতীয় জীবনাদর্শের পরিপূর্ণ প্রকাশ তখনই প্রত্যক্ষগোচর হবে।')

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, নিবেদিতাপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেছিলেন সারদাদেবী। নিবেদিতার ভারতীয় ধ্যান-ধারণায় সারদাদেবীর স্থান শ্রীরামকৃষ্ণের সমতুল্য। পবিত্রতা ও প্রশান্তির মূর্তবিগ্রহ সারদাদেবী তাঁর কাছে—To me it has always appeared that she is Sri Ramkrishna's final word as to the ideal of Indian womanhood.'[২৫] বাস্তবিক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের স্বাভাবিক সংস্কারে বিকশিতা সারদাদেবী যে উদার অসাম্প্রদায়িকতায় তাঁর এই

২৩, ২৫ *The Master As I saw Him :* The Holy Women পরিচ্ছেদ।

২৪ *The Web of Indian Life :* The Oriental Woman প্রবন্ধ।

বিদেশিনী কন্যাকে সব ছুঁৎমার্গের ঊর্ধ্বে আপনবক্ষে টেনে নিয়েছিলেন, নিবেদিতার ভারতবর্ষ-উপলব্ধিতে তা সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছিল। গুরুর কাছে তিনি ভারতের সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর যেসব কাহিনী শুনেছিলেন, সারদাদেবীর মধ্যে ভারতীয় নারীর সেই মাধুর্য নম্রতা ও মহত্তম আদর্শে জীবনযাপনের প্রত্যক্ষ রূপমুর্তি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। শুধু অতীত ভারতবর্ষ নয়, ভবিষ্যৎ ভারতের নারী-জীবনের প্রেরণারূপেও এই মহীয়সী নারীর জীবন ও সাধনা তাঁর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের এই অন্তঃপুরবাসিনীদের সান্নিধ্যে এসেই নিবেদিতা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছেন—The Indian home thinks of itself as perpetually chanting the beautiful psalm of custom. To it, every little act and detail of household method and personal habit is something inexpressibly precious and sacred, an eternal treasure of the nation, handed down from the past, to be kept unflawed, and passed on to the future.[২৬]

ভারতীয় জীবনধারার এই সামগ্রিক ছন্দটি অনুধাবন করাই নিবেদিতার ভারত-দর্শনের বৈশিষ্ট্য। বিদেশী ও স্বদেশী এমন অনেক সমালোচককে আমরা জানি যাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করতে যান বলেই অসহিষ্ণু ব্যস্ততায় নেতাবাদী সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান। *The Web of Indian Life* গ্রন্থের ভূমিকায় সে কথা মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—Those who have no ear for music, hear sounds but not the song.[২৭] অনেক কাল কোনো

২৬ *The Master As I Saw Him :* The Holy Women অধ্যায়।
২৭ *The Web of Indian Life :* The Sister Niavedita : Introduction : Rabindranath Tagore.
বইটির প্রথম প্রকাশ মে ১৯০৪। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার তারিখ ২১শে অক্টোবর ১৯১৬। বইটির চতুর্থ মুদ্রণ হয় অক্টোবর ১৯১৪ এবং পুনরায় মুদ্রণ জুলাই ১৯১৮। সুতরাং এই পঞ্চম মুদ্রণের আগে ভূমিকাটি লিখিত।

দেশবিশেষে বাস করলেই সে দেশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের অধিকার জন্মায় না। সে দেশের প্রাণছন্দটি অনুভব করার ক্ষমতা যাঁর আছে, তিনিই সংগৃহীত তথ্যস্তূপের অন্তরালে নিহিতার্থের সন্ধান দিতে পারেন। 'গানের কান যাদের তৈরি হয় নি, তারা আওয়াজ শোনে, গানটি শুনতে পায় না।'

ভারততীর্থের সন্ধানী মধুকরদের সঙ্গে সহজেই নিবেদিতার প্রাণের ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, জগদীশচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, যদুনাথ সরকার, ওকাকুরা, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, আনন্দ কুমারস্বামী, হ্যাভেল, র‍্যাটক্লিফ, দীনেশচন্দ্র, নন্দলাল, অসিত হালদার—চিরন্তন ভারতের অন্বেষণে দেশ ও দেশান্তরের আরো অসংখ্য যাত্রীদল নিবেদিতার চিত্তপ্রাঙ্গণে মিলিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এই মনীষী-সমাবেশের দিক থেকে দেখলেও নিবেদিতার প্রেরণাশক্তি অপরিমেয় বিস্ময় ও গৌরবের বস্তু।

বাংলার নবজাগরণে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ধর্ম জাতীয়তা সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক থেকে বাঙালী ও ভারতবাসীর চিত্তলোকে অক্ষয় প্রভাব বিস্তার করেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শুধু উনবিংশ শতাব্দীর মহান পুরুষদেরই অন্যতম নন, তিনি স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের শাখাপ্রশাখায় হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্যবধানের রেখাটি স্পষ্টতর হয়ে উঠলেও মহর্ষির নিজস্ব ধ্যানের জগৎটিতে প্রাচীন ঐতিহ্যের মূল্য বিশেষভাবে স্বীকৃত। তা ছাড়া স্বদেশী-সংস্কৃতির যে সাধনা ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডলে যাত্রা শুরু করেছিল, নিবেদিতার সঙ্গে তার প্রাণের মিল সহজেই ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সরলাদেবী—ঠাকুর-পরিবারের এই তিনজনের সঙ্গে নিবেদিতার বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। 'ভারতী'-সম্পাদিকা সরলাদেবী বিবেকানন্দের কাছে প্রতীচ্য জগতে ভারতের বাণী প্রচারের জন্য বিশেষভাবে যোগ্য রূপে

বিবেচিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের জন্য পাশ্চাত্যের নিবেদিতা ও পাশ্চাত্যের জন্য ভারতের সরলাদেবীকে উপস্থাপিত করার পরিকল্পনাও তাঁর মনে এসেছিল। কিন্তু বিবেকানন্দের সে-আহ্বানে নানা কারণে সরলাদেবী সাড়া দিতে পারেন নি। অবশ্য বিবেকানন্দের চিন্তাধারা তাঁর জীবনে যে কী গভীর পরিবর্তন এনেছিল সে কথা 'জীবনের ঝরাপাতা'[২৮]গ্রন্থে পরম আন্তরিকতায় বিধৃত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পর একদিন মহর্ষির আহ্বানে নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের অপরূপ আতিথ্যের স্মৃতি নিবেদিতার মনে জাগরূক ছিল। মহর্ষির সঙ্গে সেদিন তাঁর নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।[২৯]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় (১৮৯৮) থেকেই এ দুই মনীষী পরস্পরের মহত্ত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের দিনটিতে রবীন্দ্রনাথের আকৃতি কণ্ঠস্বর ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।[৩০] অন্যান্য মিশনারি সম্প্রদায়ের মতো তাঁকেও প্রথমে সাধারণ প্রচারকারিণী মনে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবু, প্রথম দর্শনেই এমন কোনো বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা দিয়ে থাকবে যে জন্য নিজের মেয়ের শিক্ষার ভার তিনি নিবেদিতাকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা বাইরে থেকে কোনো শিক্ষার ভার চাপিয়ে দিতে রাজী হন নি। জাতিগত ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ

২৮ একুশ অধ্যায় : 'সম্পাদকীয় জীবন—স্বামী বিবেকানন্দ' : পৃ ১৬০ ১৬২ : জীবনের ঝরাপাতা।

২৯ নিবেদিতার পত্র—১৫ ২.৯৯ : ভগিনী নিবেদিতা : প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।

৩০ *Sister Nivedita of Ramakrisha-Vivekananda : Pravrajika Atmaprana* পৃ ২৩৮।

প্রবণতার ভিত্তিতে শিক্ষার আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।[৩১] কন্যার ক্ষেত্রে এ অনুরোধ পালিত না হলেও নিবেদিতার শিক্ষাদর্শের কিছু প্রভাব তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্রের ক্ষেত্রে হয়তো কার্যকরী হয়েছিল। ১৯০৪ সালে কলকাতা থেকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা তাঁর চিঠিতে লক্ষণীয়—'বুধগয়ায় আমার যাওয়া ঘটে কিনা সন্দেহস্থল। পিতার শরীর অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। যাই হোক ছেলেদের নিয়ে তোমরা যেয়ো। সিস্টার নিবেদিতার ও জগদীশের সংসর্গে ও আলাপ আলোচনায় তাদের বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করচি। নিবেদিতা ওদের জন্য উৎসুক হয়ে আছেন। তিনি ওদের ইতিহাস শিক্ষার ভার নিয়েছেন—সেইজন্যে এই উপলক্ষে তিনি ওদের সঙ্গে আলাপ করে নিতে চান। বুধগয়ায় বসে তিনি ওদের ইতিহাসচর্চার ভূমিকা স্থাপন করে দিতে পারেন।'[৩২]

নিবেদিতার নানা পরিকল্পনার মধ্যে Boys' Home একটি—এই ছাত্রাবাসের ছাত্রেরা ছ'মাস আবাসিক শিক্ষালাভ করবে, আর ছ'মাস দেশভ্রমণের দ্বারা শিক্ষালাভ করবে। প্রথম ছ'মাসের পরিকল্পনা তখনি কাজে পরিণত হয় নি, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুসারে ১৯০৩-এর এপ্রিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে 'বিবেকানন্দ হোমে'র যে ছাত্রদল কেদার-নাথের উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করে রথীন্দ্রনাথ সেই ছাত্রদলে ছিলেন।[৩৩] "When father heard from Sister Nivedita that one of the monks from Belur Math—Sadananda Swami—was going to lead one such group to the shrine of Kedarnath in the Western Himalayas, he made up

৩১ পরিচয়: রবীন্দ্রনাথ: 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধ। ৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩।

৩৩ প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার পূর্বোল্লেখিত নিবেদিতা জীবনী পৃ ১৬০

his mind to send me along with them. Father thought that this sort of a hiking trip would be a good preliminary training for the life of hardship he intended me to take up, as a pupil of Brahmacharya Asrama at Santiniketan."[৩৪]

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে একটি বিদ্যালয় গড়ে তুলতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।[৩৫] কিন্তু বাগবাজারে তাঁর নিজস্ব কর্মক্ষেত্র ছেড়ে অন্যত্র কিছু করা নিবেদিতার পক্ষে সম্ভব হয় নি। 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার যে প্রবল ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করেছেন, সেদিক থেকে হয়তো তাঁর স্বাধীন কর্মক্ষেত্র নির্বাচনই শ্রেয়তর হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তের ও বিশ শতকের গোড়ায় ধীরে ধীরে যে স্বদেশী মনোভাবের সূচনা দেখা দিয়েছিল, রথীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সে ভাবধারার আন্দোলনে পরিণতির কারণ হিসাবে প্রধানতম দুটি ব্যক্তিত্ব—ভগিনী নিবেদিতা ও কাউন্ট ওকাকুরা। ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনে নিবেদিতার দান সম্বন্ধে রথীন্দ্রনাথের মন্তব্য এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—"She had the zeal of a convert and was more of an Indian than any native-born. Inspired by the patriotic feelings of her guru, the Irish blood in her did not let her remain passive. Her dynamic personality drove her to become a torchbearer of the cause of India's freedom and her rehabilitation in spiritual and cultural status."[৩৬]

৩৪। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *On the Edges of Time* পৃ ৪৫ এবং 'হিমালয়ভ্রমণ' পরিচ্ছেদ—'পিতৃস্মৃতি'।

৩৫ ভগিনী নিবেদিতা : প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা পৃ ২৭৪

৩৬ *On the Edges of Time* : পৃ: ৬৮-৬৯।

সমসাময়িক যুগে শিক্ষা, জাতীয়তা, বিজ্ঞানসাধনা, স্বদেশী শিল্প, স্বাধীনতা-আন্দোলন—এমনি নানা বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথের সমপ্রাণতা ছিল। বিভিন্ন সময়ে নানা উপলক্ষে দুজনের দেখাসাক্ষাৎ ঘটলেও পরস্পরের সান্নিধ্যে তাঁরা সবচেয়ে বেশি দিন ছিলেন শিলাইদহে ও বুদ্ধগয়ায়। ১৮৯৯এর ১৬ই জুন রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিবেদিতার শ্রদ্ধাবিজড়িত প্রীতির যে নির্দশন মেলে, তখন অবধি তাঁদের স্বল্পকালীন পরিচয়ের কথা মনে থাকলে তা নিবেদিতার অশেষ গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক।[৩৭] জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব নিবেদিতার কাছে রবীন্দ্রসান্নিধ্য আরো আগ্রহের বিষয় করে তুলেছিল সন্দেহ নেই। আধুনিক ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এই ত্রয়ীব্যক্তিত্বের সমাহার চিরস্মরণীয়। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় নিবেদিতার অমিত উৎসাহের কারণও বর্তমান পৃথিবীতে ভারতবর্ষের নিজস্ব মহিমার আত্মপ্রকাশ।[৩৮] বসুবিজ্ঞানমন্দিরের সম্মুখভাগে কল্যাণদীপ হস্তে যে নারীমূর্তি প্রজ্ঞালোক বিকীর্ণ করছেন, তিনি নিবেদিতারই কল্পরূপ।

কবির চেতনায় নিবেদিতার পুণ্যপ্রভাব দেখা দিয়েছে আর-এক ভাবে। 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি। নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই।" স্বদেশীযুগের কবিতা ও সংগীতে রবীন্দ্রনাথের ভারত-তন্ময়তা ও বিশেষভাবে বাংলাদেশের জননীমূর্তির উদ্দেশে অন্তরের আকুলতানিবেদনের অন্যতম প্রেরণা ভগিনী নিবেদিতা।

৩৭, ৩৮ চিঠিপত্র : রবীন্দ্রনাথ : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ ১৪৫-১৫৩ ; রবীন্দ্রনাথকে লিখিত নিবেদিতার পত্র।

সাধারণত 'কালী-প্রতীকে'র প্রতি রবীন্দ্রমানসে বিশেষ কোনো আকর্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু স্বদেশীযুগের পরিমণ্ডলে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' গানটির চিত্রকল্পে যখন দেখি—

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।···
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী!—

তখন নিবেদিতার কালী-অনুধ্যানের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে। ভারতবাসীর চিত্তলোকে দেশজননীর কালিকামূর্তিতে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাঁরই নিজস্ব।

অবশ্য রবীন্দ্রসাহিত্যে নিবেদিতার প্রেরণা সবচেয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে। সমগ্র যুগচেতনার প্রকাশরূপে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসটি মহাকাব্যোপম। আর সে উপন্যাসের নায়ক সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে জাত আইরিশ রক্তের সন্তান 'গোরা'। সমগ্র জীবন ও চেতনা দিয়ে 'হিন্দু' হতে চেয়েও শেষ অবধি তার জন্মসূত্রে সে হিন্দুসমাজের বহির্ভূত হল। কিন্তু আনন্দময়ীরূপে ভারতবর্ষ তাকে আপন বুকে টেনে নিলেন।

বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতা যে ভারতবর্ষের অনেক মন্দিরে—এমনকি তাঁর গুরুর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের উপাসিতা দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করতে পারতেন না—সে বেদনাদায়ক সত্য আমাদের চরম লজ্জার কথা। তবু, কোনো ক্ষোভ, কোনো অভিমান এই ভারতপ্রাণার হৃদয়কে মুহূর্তের জন্য বিমুখ করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ হয়তো হিন্দু-সমাজের তদানীন্তন এই সংকীর্ণতা স্মরণ করেই নিবেদিতাকে গল্পটি বীজাকারে শোনাবার সময় গোরার সঙ্গে সুচরিতার মিলন ঘটতে দেন নি। প্রসঙ্গত পিয়ার্সনকে লেখা 'গোরা' -প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণীয়—'You ask me what

connection had the writing of *Gora* with Sister Nivedita. She was our guest in Shilida and in trying to improvise a story according to her request I gave her something which came very near to the plot of *Gora*. She was quite angry at the idea of Gora being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin. You won't find it in *Gora* as it stands now—but I introduced it in my story which I told her in order to drive the point deep into her mind.[৩৯]

সংরক্ষণশীলতা যেমন নিবেদিতাকে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে দেয় নি, তেমনি আর-এক দিক থেকে সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে চিরন্তন ভারতবর্ষ নিবেদিতাকে আপন কন্যারূপে গ্রহণ করেছে।

নিবেদিতাচরিত্রে যে যোদ্ধৃভাব—'বলবান আক্রমণের বাধা' এবং অপরের মনকে পরাভূত করার উৎসাহ রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, তা গোরা-চরিত্রের অন্যতম মূল উপাদানে পরিণত। হিন্দু-ঐতিহ্যের প্রতিটি অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্তের সমর্থনে গোরার অনন্যসাধারণ যুক্তিশাণিত সংলাপও নিবেদিতার আলাপচারির ভঙ্গিমায় প্রভাবিত। ব্রাহ্মসমাজ যে ভারতীয় ঐতিহ্যেরই আধুনিক রূপ—তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সমগ্র হিন্দুসমাজ ও চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়—আদি ব্রাহ্মসমাজের এই দূরদৃষ্টি নিবেদিতার গোরা-চরিত্রে রূপান্তরের মাধ্যমে আমাদের অখণ্ড জাতীয়তাবোধকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

---

৩৯ Visva-Bharati Quarterly. August-October 1943 পিয়ার্সনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র (১৯২২)। চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ডে উদ্ধৃত।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের এক বা একাধিক গল্প নিবেদিতা অনুবাদ করেছিলেন। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের অনুবাদটি প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া আরো গল্পের অনুবাদ তিনি করেছিলেন মনে করার কারণ আছে।

প্রসঙ্গত গোরার অজস্র উক্তির মধ্য থেকে একটিমাত্র উপস্থাপিত করি—"আমাকে আপনি একটা গোঁড়া ব্যক্তি বলে মনে করবেন না। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে গোঁড়া লোকেরা, বিশেষত যারা হঠাৎ নতুন গোঁড়া হয়ে উঠেছে, তারা যে ভাবে কথা কয় সে ভাবে গ্রহণ করবেন না। ভারতবর্ষের নানাপ্রকার প্রকাশে এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল। সেই ঐক্যের আনন্দেই, ভারতবর্ষের মধ্যে যারা মূঢ়তম তাদের সঙ্গে এক দলে মিশে ধুলোয় গিয়ে বসতে আমার মনে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ হয় না। ভারতবর্ষের এই বাণী কেউ-বা বোঝে কেউ-বা বোঝে না—তা নাই হল—আমি আমার ভারতবর্ষের সকলের সঙ্গে এক; তারা আমার সকলেই আপন; তাদের সকলের মধ্যেই চিরন্তন ভারতবর্ষের নিগূঢ় আবির্ভাব নিয়ত কাজ করছে সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহমাত্র নেই।"

গোরার প্রবল কণ্ঠের এই কথাগুলি ঘরের দেয়ালে, টেবিলে, সমস্ত আসবাবপত্রেও যেন কাঁপিতে লাগিল।" (২০শ অধ্যায়, গোরা)

এই বক্তব্য ও বক্তার প্রবল ব্যক্তিত্ব—দুইই নিবেদিতা-চরিত্র-সম্ভব। ভারতবর্ষের অন্তরতম পরিচয়-লাভে নিবেদিতার পরমা সিদ্ধির কথা মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ এর কারণ বিশ্লেষণ করেছেন *The Web of Indian Life*-এর ভূমিকায়—She had won her access to the inmost heart of our society by her supreme gift of sympathy. She did not come to us with the impertinent curiosity of a visitor, nor did she elevate herself on a special high perch with the idea that a bird's eye view is truer than the human view because of its superior aloofness. She lived our life and came to know us by becoming one of ourselves."

জাতিহিসাবে আমাদের দোষ-ত্রুটি কোথায়, তা নিবেদিতার

অজানা ছিল না। কিন্তু সে দোষ-ত্রুটির বিবরণ জাতির সামগ্রিক পরিচয়কে ছাপিয়ে উঠত না। "And because she had a comprehensive mind and extraordinary insight of love she could see the creative ideals at work behind our social forms and discover our soul that has living connexion with its past and is marching towards its fulfilment."

প্রেমের এই অন্তর্দৃষ্টিবলেই ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় জীবনধারার মৌলসত্যের (vital truths) বাণী উচ্চারণ করতে পেরেছেন। এ অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ধীরে ধীরে খুলে গেছে। ভারতবর্ষে আসার প্রথম দিকে তিনি প্রধানতঃ সেবিকা। পাশ্চাত্যের সংস্কার, এমনকি ব্রিটিশ পতাকার প্রতি অন্ধ আনুগত্য পর্যন্ত তাঁর মনে বহুদিন সক্রিয় ছিল। তার পর বিবেকানন্দের প্রেরণায় সেই জাতীয়তাবাদের অবলম্বন হয়ে উঠল ভারতবর্ষ। আসলে, ভারতবর্ষকে মাতৃভূমিরূপে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেই তিনি স্বাদেশিকতার সংকীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে এলেন।

গোরা-চরিত্রের একটি মূলসূত্র তার জন্মরহস্য। কেউ কেউ এ রহস্যকে উপন্যাসটির প্রধান দুর্বলতা মনে করেছেন। কিন্তু এ রহস্য জীবনসত্যেরই রূপকমাত্র। সত্য যে বিশেষ দেশ কাল ও সমাজের দ্বারা বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত হতে পারে না, তারই নিশ্চিত প্রমাণ নিবেদিতা এবং নিবেদিতা-প্রণোদিত গোরা-চরিত্র।

গোরার ভারত-অনুসন্ধান আমাদের জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমানবিকতার স্তর-পরম্পরা। জাতি ও বিশ্বের এই সংযোগসূত্রটি আমরা ভগিনী নিবেদিতার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ইতিহাসের দরবারে জাতির যে নিজস্ব পরিচয়পত্রটি সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, সেই জাতীয়তাবোধের প্রেরণাই ভারতীয় শিক্ষাধারায় নিবেদিতা সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন।

Hints on National Education in India গ্রন্থের Paper

on Education IV অধ্যায়ে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য—"Education in India to-day has to be not only national but Nation-making.···The centre of gravity must lie for them outside the family, we must demand from them sacrifices for India, bhakti for India, learning for India. The ideal for its own sake. India for India. This must be as the breath of life to them."।

এই একান্ত জাতীয়তাবাদী আদর্শের যুগপ্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তিনি জানতেন, "In the last and final court, it may be said, humanity is one and the distinction between native and foreign purely artificial."[৪০] চূড়ান্ত বিচারে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে মানবতা এক ; আর দেশী ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্যবোধ একান্ত কৃত্রিম।

নিবেদিতার মতো আর ক'টি জীবনে এ মহান সত্য প্রমাণিত হয়েছে!

নিবেদিতা চরিত্রের দুটি দিগন্ত—এক দিকে তাঁর নিরন্তর সংগ্রাম, আর-এক দিকে তাঁর পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। সে আত্মনিবেদনের একটি প্রকাশে তিনি 'লোকমাতা'—ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর অসাধারণ মমতা। তাঁর জাতীয়তাবোধ হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ—সর্বধর্মসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করেই এক অসাম্প্রদায়িক ভারতচেতনায় সার্থক। আর-এক দিকে গুরুর প্রতি নিষ্ঠায়, সত্যের জন্য সর্বস্বত্যাগে, অধ্যাত্ম উপলব্ধির অতল গভীরতায় তিনি ধ্যানমগ্না তপস্বিনী। বুদ্ধ ও যীশু, মেরী ও কালী, শিব শক্তি, ব্রহ্ম ঈশ্বর— দেশে দেশে কালে কালে মানবপ্রাণে পরমপ্রকাশের সব প্রতীকগুলি তাঁর অন্তরে এসে মিলিত হয়েছে।

---

৪০ "The Place of Foreign Culture in a true Education" : *Hints on National Eduction in India.*

বুদ্ধগয়ায় নিবেদিতার সহযাত্রী রবীন্দ্রনাথ 'ফুজি' নামে গরীব জাপানী জেলেটির মুখে প্রতি সন্ধ্যায় বোধিদ্রুমতলে যে আবৃত্তি শুনতেন—

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়, নমো নমো গোতমচন্দিমায়।

নমো নমো নন্তগুণণ্ণবায়, নমো নমো সাকিয়নন্দনায়॥

পরবর্তীকালে 'নটীর পূজা'য় সে শ্লোকটি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু শুধু কি ফুজির ওই আবৃত্তি? তারই পাশাপাশি নিবেদিতার বুদ্ধ ও ভারতের প্রতি আত্মনিবেদনও কি তাঁর অন্তরের রসলোকে শ্রীমতীর আত্মনিবেদনের গানে পরিণত হয় নি।—'বন্দনা মোর ভংগীতে আজ সংগীতে বিরাজে'। শ্রীমতীর ওই অনন্যশরণ সাধনার বাস্তব প্রতিরূপ তিনি তো নিবেদিতার জীবনেই দেখেছিলেন।

নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের মানস-ঐক্যের আর-একটি সূত্র তাঁদের কবিচেতনায়। দূরতম অতীত ও ভবিষ্যতে প্রসারিত রোমান্টিক কবিচৈতন্য দুইজনেরই মনোধর্ম। নিবেদিতার গদ্যরচনায় কাব্যস্পন্দন তো ক্ষণে ক্ষণেই চোখে পড়ে, অভিধা ও ব্যঞ্জনায় সম্পূর্ণ কবিতাও তিনি বেশ কিছু লিখে গেছেন। স্বামীজীর জীবনকালে ১৯০০ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত তাঁর 'Kali the Mother' গ্রন্থে তাঁর কবিতার প্রথম প্রকাশ। এ গ্রন্থের এবং পরবর্তীকালে 'An Indian Study of Love and Death' গ্রন্থের কবিতাগুলি গদ্যে লেখা। ইংরেজী গদ্য কবিতায় নিবেদিতার কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়। ভারতবর্ষ, কালী ও বিবেকানন্দ—তাঁর কবিতার প্রধানতম বিষয়।

Footfalls of Indian History (১৯১৫)-গ্রন্থের সূচনায় তাঁর ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে কবিতাটির অংশবিশেষ প্রথমে উদ্ধৃত করি—

We hear them, O Mother!
Thy footfalls,
Soft, soft, through the ages
Touching earth here and there,
And the lotuses left on Thy footprints

Are cities historic,

Ancient scriptures and poems and temples,

Noble strivings, stern struggles for Right.

৪ঠা জুলাই, ১৯০২—তারিখটি নিবেদিতা কোনো দিন ভোলেন নি—তাঁর গুরু বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের তারিখ।[৪১] বিবেকানন্দ-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটি লিখেছিলেন ৪ঠা জুলাই তারিখে পাঁচ বৎসর পরে। বান্ধবী ম্যাকলাউডের কাছে তাঁর প্রাণের অভিব্যক্তি—'To me he was all love'। মৃত্যু সেই প্রেমেরই আর-এক মূর্তি।

"Then can I not watch and pray beside him while he sleeps, or wait to join him in that self-same silence?"[৪২]

"And of that Knowledge, the Knowledge of the Beloved,

Presence and absence are but two different modes."[৪৩]

কম্পমান হোমশিখার মতো তাঁর প্রেমস্তোত্র—

"Love all transcendent,

Tenderness unspeakable,

Purity most awful,

Freedom absolute,

Light that lightest every man,

Sweetest of the sweet, and

---

৪১ একটু আকস্মিক যোগাযোগ মনে হলেও এ কথা স্মরণীয় যে, ৪ঠা জুলাই তারিখেই (১৮৯৮) হিমালয়-পরিভ্রমণের সময় বিবেকানন্দ আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসটির উদ্দেশে তাঁর বিখ্যাত To the Fourth of July কবিতাটি লেখেন।

৪২, ৪৩ *An Indian Study of Love and Death* (১৯০৫)

Most Terrible of the terrible,
To thee our salutation,
Thee we salute. Thee we salute.
Thee we salute."[৪৪]

যে অন্তরতম আকুলতা ওই মৃত্যুমুহূর্তটিকে ঘিরে অনুক্ষণ গুঞ্জরিত হত, তারই কিছু অনুরণন তিনি রেখে গেছেন *An Indian Study of Love and Death*-এর কবিতাগুচ্ছে। উৎসর্গপত্রে তাঁর না-বলা বাণীর বেদনা স্বল্পতম ভাষায় সংহত—Because of Sorrow—আর নীচে লেখা নামের আদ্যক্ষর N.

কবি ও শিল্পীর দৃষ্টিতে নিবেদিতা সতী ও উমায় রূপান্তরিত। তাঁর সাধনা প্রেম আত্মত্যাগ—ভারতীয় মানসের মহত্তম কবিকল্পনার কথাই বারংবার মনে করিয়ে দিয়েছে।

"শিবের মধ্যেই যে সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে, তিনি কি বাহিরের ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন? ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্যদুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল।"—বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

"সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রূপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল।...সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর।"—'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের এই বর্ণনারই ভাষান্তর তাঁর অনন্য ছবি 'উমা'।

নিবেদিতার প্রয়াণ-উপলক্ষে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর শ্রদ্ধা-নিবেদনের অর্ঘ্য সাজিয়েছেন—

৪৪ *An Indian Study of Love and Death* (১৯০৫)। এ প্রবন্ধে উদ্ধৃত কবিতাগুলির অনুবাদ এই সংকলনে দ্রষ্টব্য।

তপস্যার পুণ্যতেজে করেছিলে অসাধ্য সাধন,
জ্বেলেছিলে স্বর্ণদীপ অন্ধকারে ; নব উদ্বোধন
করেছিলে জীর্ণ বিল্বমূলে মাতৃরূপা শকতির ;
স্মরিয়া সে সব কথা আজ শুধু চক্ষে বহে নীর।
এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়,
চলে গেলে অল্প আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়, —
দেহ রাখি' শৈলমূলে ;—শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী ;
ওগো দেবতার দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী।

—নিবেদিতা : কুহু ও কেকা

সতী ও উমার মতো নিবেদিতার মানসপটভূমিতেও হিমালয় সমাহিত ধ্যানের প্রতীক। ভারতের সেই যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত সাধনারই আর-এক রূপায়ণ ভারতীয় শিল্পকলায়। হ্যাভেল-অবনীন্দ্রনাথ-আনন্দকুমারস্বামী-নন্দলালের সমবেত প্রতিভায় পুনরুজ্জীবিত ভারত-শিল্পের পীঠভূমি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। আর এ শিল্পের প্রাণময়ী প্রেরণাশক্তি ভগিনী নিবেদিতা। সমসাময়িক যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়েও এক অর্থে এই ভারতশিল্প-আন্দোলন আমাদের জাতীয় সত্তার জাগরণে অনেক বেশি সহায়ক হয়েছিল। তার কারণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবলোকে নিবেদিতা ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি মূলসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতশিল্পের নিজস্ব ভঙ্গিমায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তো নিজেই অপূর্ব মূর্তি গড়তে পারতেন, ছবি আঁকতে পারতেন। তাঁর অধ্যাত্মসাধনায় ভারতীয় চিত্তে পৌরাণিক রূপকল্পের নবপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। বিবেকানন্দের ধ্যাননেত্রে বিভিন্ন ধর্মমন্দিরের স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব সমন্বয়ে ফুটে উঠেছে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের মানসচিত্র। রামকৃষ্ণ মিশনের সর্পবেষ্টিত প্রতীকচিহ্নটি বিবেকানন্দের শিল্পসৃষ্টির অভ্রান্ত সাক্ষ্য—"চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরি-বেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর

চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়—চিত্রের ইহাই অর্থ।"—স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

ভারতশিল্পের অধ্যাত্মবাণীর প্রেরণা ভগিনী নিবেদিতায় হৃদয়ে আর একটি প্রতীকের সৃষ্টি করেছিল—বিশ্বকল্যাণে উৎসর্গিতপ্রাণ দধীচিমুনির অস্থিনির্মিত বজ্র। এ বজ্রপ্রতীক তাঁর গ্রন্থাবলীতে প্রতীক-চিহ্নরূপে ব্যবহৃত, তাঁর পরিকল্পিত জাতীয় পতাকার কেন্দ্র-স্বরূপ।

গ্রীক ও পাশ্চাত্যশিল্পকলার অনুকরণচিন্তা থেকে ভারতীয় শিল্পী-মানসকে মুক্ত করে তিনি যে ভারতীয়তার আদর্শ শিল্পীদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথের পরে সে আদর্শের মহত্তম প্রকাশ নন্দলালের শিল্পসৃষ্টিতে। শুধুমাত্র ইতিহাস পুরাণে নয়, আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত সংগ্রামে সর্বস্তরের প্রকাশে ভারত-শিল্পের নিজস্ব সিদ্ধির পরিচায়ক নন্দলালের বিচিত্র শিল্পসাধনা।

ভারতশিল্পের যাত্রারম্ভ থেকে এই শিল্পাদর্শে এদেশের ও বিদেশের শিল্পজিজ্ঞাসুদের শিক্ষিত করে তোলার ব্রত নিবেদিতা গ্রহণ করে-ছিলেন। মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশিত তাঁর এই জাতীয় শিল্পব্যাখ্যার আংশিক উদাহরণ নন্দলালের 'সতী'-চিত্র-পরিচায়িকা থেকে উদ্ধৃত—

"Had the painter of this picture been a European we should unquestionably have had the subject presented to us as a fine-looking woman, drawn to her full height, and facing the spectators in a mingling of beauty and triumph. Nothing can be more significant of the distinctive character of Indian feeling, however, that the way in which Mr. Nanda Lal Bose has here set himself to approach the idea. We see before us a woman, beautiful indeed, and adorned like a bride, with her whole mind set on the moment of triumph,

yet without the slightest consciousness of her own glory. The form is pure sattva, without one particle of rajas, as the Indian thinker might express it. The spirelike flames leap up. She kneels throned on a summit of fire, Yet there is no fear. No farewell song is mingled with her praying. Her eyes see nothing—neither the flames beneath, nor the loved one she is leaving—nothing at all, save the sacred form of him who she is about to rejoin. Her mind is quiet, flooded with peace. The moment is one of union. She knows nothing of separation."[৪৫]

এ শুধু চিত্র-পরিচয় নয়, ভারতাত্মার অন্তরময় অনুভব। আর-এক অর্থে এ তাঁরই আত্মপরিচয়। যে জীবনসাধনায় তিনি এ প্রজ্ঞাদৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন, তা মৃত্যুর অন্ধকার বিদীর্ণ করে অমৃতের শাশ্বত অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। গুরুর কাছে তো তিনি শুনেছিলেন, "সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে ভালোবাসা।...মৃত্যু অনিবার্য জেনে নিজেকে সর্বতোভাবে তিলে তিলে অন্যের জন্য উৎসর্গ করতে হবে।"

দেহাবসানের কিছুদিন আগে দীনেশচন্দ্র সেনের কাছ থেকে নিবেদিতা 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র একটি প্রস্তরমূর্তি চেয়ে এনেছিলেন। এ মূর্তি যার কাছে থাকবে, তার অকল্যাণের সম্ভাবনা—এই সংস্কার-বশে দীনেশচন্দ্র মূর্তিটি প্রথমে দিতে চান নি।

নিবেদিতা ঐতিহাসিকের মুখে এই অন্ধসংস্কারের কাহিনী শুনতে চান নি। তিন মাস পরে তাঁর অকালপ্রয়াণে[৪৬] কেউ কেউ অন্ধ-সংস্কারেরই জয় হয়েছে ভেবে ব্যথিত হয়ে ছিলেন। কিন্তু নিবেদিতার

৪৫ The Complete Works of Sister Nivedita Vol III : p 67

৪৬ ১৩ই অক্টোবর, ১৯১১

অনন্ত আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ শেষবাণী—'The frail boat is sinking, but I shall yet see the sunrise.'—জীর্ণ তরী ডুবতে চলেছে, তবু সূর্যোদয় আমি দেখবোই—যখন তাঁর জীবন থেকে হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, তখন ভারত-ইতিহাসের এই প্রজ্ঞাপারমিতার দিব্যকণ্ঠ আমাদের আশ্বস্ত করে। এমন মৃত্যু আছে যা জীবনের সর্বোত্তম প্রকাশ।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ
বাংলা বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

এ সঙ্কলনে যাঁরা নানাভাবে সহায়তা করেছেন-

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

স্বামী নিরাময়ানন্দ

ডঃ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী

শ্রীশঙ্খ ঘোষ

শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীস্বদেশরঞ্জন দত্ত

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বা

ডঃ পবিত্র সরকার

শ্রীপ্রদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীতুলসী দাস

শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী

শ্রীসৌরেন বসু

ডঃ মানস রায়চৌধুরী

শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তী

শ্রীঅমিত নাগ

উদ্বোধন-কার্যালয়

শ্রীসচ্চিদানন্দ সরকার

ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

ডঃ মার্টিন কেম্পসেন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাতৃকণ্ঠ

(অনুবাদঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ)

সন্তান আমার, ওঠো জাগো, মানুষের মতো এগিয়ে যাও। জীবনের সব ভার বীরের মতো বহন করো। যা তোমার দায়িত্ব, পূর্ণশক্তিতে তা পালন করো। মাভৈঃ! ভুলে যেয়ো না, আমি তোমার মা! আমিই পুরুষের শৌর্য ও নারীর মমতার অধিষ্ঠাত্রী, সব বিজয়ের অধীশ্বরী।

জীবনকে দুর্বহ মনে করো না। ভাগ্য, সে তো মায়ের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়! এসো, কিছুক্ষণের জন্য আমার খেলায় যোগ দাও—সব কিছুকে খেলার মতো সানন্দে গ্রহণ করো।

উদ্দেশ্য কী, সে কথা ভেবে দ্বিধা জাগছে মনে? জগজ্জননী যে কন্দুকটি নিয়ে খেলা করছেন, ভাবছো তা একেবারে নিরর্থক? একথা জানো না যে, মায়ের হাতের ওই কন্দুক আসলে সেই বজ্র, যা মুহূর্তের মুদ্রাপরিবর্তনে বিশ্ববিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে? কোনো পরিকল্পনার কথা জানতে চেয়ো না। জ্যা-মুক্ত শরের কি প্রয়োজন পূর্ব পরিকল্পনার কথা জানবার? তুমিও ঠিক তেমান। জীবন উদ্‌যাপিত হোক, মূল পরিকল্পনা তখন আপনি উদ্ভাসিত হবে। যে পর্যন্ত তা না হয়, মহাকালের সন্তান, কিছুই তোমার জানার দরকার নেই।

অভ্রান্ত আমার খেলা! সারা দিনের যাত্রাপথে সেই তো নিশানা। মনে করো, এ পৃথিবীতে তোমার আসা—সে কেবল আমারই ইচ্ছায়, আর শুধু সেইজন্য আমার ইচ্ছা যখন পূর্ণ হবে, তখন আমিই তোমায় টেনে নেব আমার বুকে। প্রশ্ন করো না। কোনোদিকে ফিরে চেয়ো না। কোনো পরিকল্পনা করতে যেয়ো না। শঙ্খের মধ্যে কল্লোলিত সমুদ্রের মতো আমার ইচ্ছাই তোমার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হোক।

কিন্তু সবার আগে একথা উপলব্ধি করো। একটি পদক্ষেপও তোমার বিফল হবে না। কোনো প্রয়াসই ব্যর্থ হবে না। তোমার স্বপ্ন তোমার কীর্তির চেয়ে বড়ো নয়, ছোট হবে। সামান্য উপলক্ষ হয়তো তোমায় এখানে ওখানে নিয়ে যাবে, তারই ফলে দেখা দেবে মহৎ লক্ষ্যের পরিণাম। অনেকের সঙ্গে তোমার দেখা হবে, কথা হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে একান্ত আমার আপনজনেরা হবে অঙ্গুলিমেয়। এদের সঙ্গে তোমার গোপন সংকেত-বিনিময় হবে, এরা তোমায় অনুসরণ করবে।

কী সেই সংকেত ?

আমার সন্তানদের অন্তরের অন্তরতম গহনে ঝল্‌সে উঠ্‌ছে মহাকালীর খড়্গ। জন্ম থেকে মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত তারা বিশ্বজননীর খড়্গের অবতার। তারা দুঃখের ঝড়ের মরণের প্রেমিক—জীবনের নয়।

এমনি সব মানুষেরা আসবে তোমার আগুনে তাদের মশাল জ্বালিয়ে নিতে। আমার কণ্ঠস্বর অসংখ্য জনতায় ঘেরা এই পৃথিবীতে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ নায়কদের বলিদানের জন্য অনুসন্ধান করে ফিরছে। মনে রেখো, যে আমি আহ্বান করছি—সেই আমিই সে আহ্বানে সাড়া দেবার পন্থাও নির্ধারণ করেছি। জগজ্জননী তাঁর সৃষ্টির রক্ষয়িত্রী ও সংহারকর্ত্রী—দুইই তাঁর ভূমিকা।

ধর্মকে যে নামই দেওয়া হোক, আসলে তার অর্থ মৃত্যুকে ভালোবাসা। কিন্তু আজ আমার এই দেশে বৈরাগ্যের আগুন লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে এক প্রচণ্ড আবেগের আন্দোলন জাগিয়ে তুলবে। যেমন করে অন্য সব মানুষ সুখের সন্ধানী হয়, তেমনি করে এদেশের মানুষ আত্মত্যাগের পথে এগিয়ে যাবে। সমস্ত সেবা, শ্রম ও যন্ত্রণা সেদিন তিক্ততার বদলে মাধুর্যের রসে ভরে উঠবে। কারণ, মহান এই যুগ ; আর আমি কালী স্বয়ং, এই বিশ্বের সমস্ত জাতির জননীস্বরূপা।

পরাজয়ের মুখোমুখি হও, হতাশাকে আলিঙ্গন করো। আমার

ইচ্ছার জগতে দুঃখসুখের কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই। অশ্রুর জগতে প্রবেশ করে তাই আনন্দিত হও। আমার হাসিটির দিকে চেয়ে থাকো। এমনি গোপন গভীরে সন্তানদের সঙ্গে আমার দেখা হয়। পরম স্নেহে আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাদের লালন করি।

আমার কথা ভুলিয়ে দেয়, উন্মূলিত করো এমন সব বাসনা। আমার আহ্বান যখন আসে, তখন প্রণয়, বন্ধুত্ব, সুখ, গৃহ—কোনো কিছুর ডাক শুনতে পাওয়া যায় না। প্রাসাদের বিলাস ছেড়ে বেরিয়ে এসো, ঝাঁপ দাও ভয়ঙ্করের সমুদ্রবক্ষে; আরামের গৃহতল ছেড়ে প্রজ্বলন্ত নগরীর প্রহরী হয়ে ওঠো। জেনো একটি যদি অ-সত্য হয়ে থাকে, অন্যটিও তাই। হাসিমুখে ভাগ্যের মুখোমুখি হও।

কোনো করুণার প্রত্যাশা করো না। আমি তোমায় সর্বজীবে করুণার আধার করে তুলবো। নিজের অন্ধকারকে তুমি সাহসের সাথে বরণ করে নাও; তখনই তোমার আলো সহস্রের সমুজ্জ্বল সুখের কারণ হয়ে উঠবে। তুচ্ছতম কাজটি সযত্নে সম্পন্ন করো, মুছে ফেলো উচ্চমঞ্চের বাসনা।

যে শ্রমের দায়িত্ব তোমায় দিয়েছি, তাতে একনিষ্ঠ হও। উদ্দেশ্য ও উপায়ের সার্থক সম্মেলন হোক। সব দাবী পূরণ করো। তবু কোনো দায়ের বোঝা বহন করো না। কোনো পুরস্কারের প্রত্যাশাও নয়।

দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, নির্ভীক, স্থিতপ্রজ্ঞ হও—দিনের শেষে খেলা যখন শেষ হবে তখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করবে—আমি কালী—পুরুষের শৌর্য ও নারীর মমতার অধিষ্ঠাত্রী—সব জয়ের সংহারকারিণী—আমিই তোমার জননী।

ভগিনী নিবেদিতার 'কালী দি মাদার'-গ্রন্থের 'দি ভয়েস অফ দি মাদার' কবিতার অনুবাদ।

দক্ষিণেশ্বর

(অনুবাদ : প্রণবরঞ্জন ঘোষ)

যাদের অন্তর তোমাতে সমাহিত, তুমি তাদের পরিপূর্ণ শান্তিতে ঘিরে থাকো।—ঈশা।

তিনি তো সেই বিরাট শূন্যতায় নেই। এই পৃথিবীর একটি বাড়ির ছাদে বসে হৃদয় সেই অনন্ত আকাশের বুকের গহনে চেয়ে দেখছিল, আর মহামৌনের উপলব্ধিতে শিহরিত হয়ে উঠছিল।

তারপর তিনি এলেন, অন্তরের মধ্য থেকে যাঁর বাণী মৃদুমাধুর্যে ধ্বনিত হ'লো : 'সেই নির্জনে চলে এসো, শান্ত হয়ে ব'সো! হয়তো সেখানেই তুমি তাঁর বাণী শুনতে পাবে।' সেই প্রত্যক্ষ দেবদূত আমার,—যাঁর হাতে রয়েছে শুভ্র শিশির-স্তবক, যাঁর চরণতলে বিসর্পিত অগ্নিশিখা, যাঁর দুই চোখে চোখ রাখলে মনে হয় ঝরে পড়ছে এক দুরন্ত জলপ্রপাত—তাঁর অনুসরণ করে এ হৃদয় নানা বিচিত্র পথ পেরিয়ে প্রভুর উদ্যানে এসে পৌঁছুল। সব অশান্তি জুড়িয়ে গেল।

সেই উদ্যানের মাঝখানটিতে জেগে আছে পঞ্চবটী—যার তলায় ঠাকুর ধ্যানে বসতেন, প্রার্থনা করতেন, আর সমাধির আনন্দে ডুবে যেতেন। বিক্ষোভে বেদনায় প্রশ্নসঙ্কুল হৃদয় সেইখানটিতে এসে নৈঃশব্দ্যের সাদর আহ্বান শুনতে পেয়ে অপেক্ষারত।

পাশে কলবাহিনী গঙ্গা। ভরা পালে বিরাট বিরাট নৌকা ছুটে চলেছে। নিচে হাওয়ায় খেলা করছে শুকনো পাতা, ইঁদুরের পায়ের শব্দ হচ্ছে পাতার মর্মরধ্বনিতে, আর ঊর্ধ্বে পঞ্চবটীর শাখায় পাতায় ঝরে পড়ছে চাঁদের আলোর বন্যা, কম্পমান পত্রপল্লব ও শাখা-প্রশাখার ফাঁকে ফাঁকে বিন্দুবিন্দু চন্দ্রালোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে বেদীর উপরে।

শুধু কেবল গাছের আর নদীর আর নিঃসঙ্গ নিশাচরদের মৃদু-ভাষণ শোনা যায়……।

'ঠাকুর! যাদের সঙ্গে আমি এইখানটিতে আসতাম, তারা আজ অনুপস্থিত। অনেক দূরদেশ থেকে তারা এই স্থানটির কথা মনে করে। আজ আমি তোমার চরণে তাদের স্মৃতি নিবেদন করবো।'

তিনি বললেন, 'বেশ তো। যারা আমার, তারা তো চিরকালই আমার। তাদের সব ভার আমি বহন করি, প্রতিটি পদক্ষেপ আমিই পরিচালিত করি, সবশেষে তাদের বাঞ্ছিত লোকে উপনীত করি। সন্তান আমার! আজ তো একজন নয়, তিনজনই উপস্থিত। একথা নিশ্চিত জেনো।'

'ঠাকুর! যাদের আমি ভালোবাসি, তারা আজ বেদনার শৃঙ্খলে বন্দী। শঙ্কিত হৃদয়ে তারা পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে। জীবনের স্বাদ একেবারে তিক্ত, তাই একজনের আকাঙ্ক্ষা মৃত্যু। আর একজনের পক্ষে জীবন এত দুর্বহ যে আমরাই তার সব যন্ত্রণার অবসান চাই। ঠাকুর! তোমার কাছে প্রার্থনা, এদের তুমি স্বস্তি অনুভব করতে দাও, নয়তো সেই আলো দাও, যে আলোর কাছে কোনো সুখের কামনাই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না।'

স্মিতহাস্যে তিনি সব শুনছিলেন।

'এমন তো হতে পারে না, ঠাকুর, যে, মানুষের জন্য আমরা কিছুই করতে পারবো না। ওরা যারা প্রচণ্ড দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি, মৃত্যুর করাল দৃষ্টির সামনে কম্পমান, আসন্ন প্রিয়বিচ্ছেদের বেদনায় বিদীর্ণ-হৃদয়, ওরা যারা বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন পঙ্কশয্যায় শুয়ে থাকে, নিরন্ন, নিরক্ষর, নিপীড়িত—তাদের দুঃখের কোনো অংশই আমরা বহন করতে পারবো না—এতো হতেই পারে না, ঠাকুর। তুমি কখনো একথা বলতে পারো না যে, সংগ্রামের প্রচেষ্টার কোনো মূল্যই নেই।'

'কি তোমার প্রয়োজন?'

'যদি কিছু নাও করতে পারি, তাহলে শুধু ওদের ব্যথা ও বিপদের

অংশভাগী হওয়া! শুধু ওদের ললাটে সান্ত্বনার স্পর্শটুকু রাখা—ওদের জন্য দায়ী হবার অধিকারটুকু পাওয়া, ওরা যখন যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত, তখন ওদের থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মনে না করা—শুধু এই-টুকুই আমার প্রার্থনা।'

'এই কি সব ?'

'না, সত্যিকারের সেবার অধিকার যদি পাই সেই তো পরম আশীর্বাদ। যদি সত্যিই কারো সহায়তা করতে পারি, তবে তো পেয়ালা ভরে উঠবে কানায় কানায়। তবু যদি এ অধিকার নাও মেলে, আমাদের সেই নিঃস্বার্থ কর্মের স্বাধীনতা দাও। দৈনন্দিন তুচ্ছ প্রয়োজনের গণ্ডী থেকে আমাদের মুক্ত ক'রো। যেন সর্বস্ব দিতে পারি, উৎসর্গ করতে পারি, আর জীবন-মৃত্যুর প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন চিত্তে তোমাতেই মগ্ন হয়ে থাকতে পারি।'

দীর্ঘ নীরবতা।

অবশেষে প্রশান্ত অথচ মৃদু ভৎর্সনায় সেই দিব্যকণ্ঠ ধ্বনিত হলো—'ওরে আমার অবুঝ সন্তানেরা! তোদের কি এখনও একথা বলে দিতে হবে যে, তোদের অন্তরের এই যে ভালোবাসা সেও আমারই ভালোবাসা। যা একান্ত আমারই দান, তাই নিয়ে কি তোরা আমারই সাথে দাবীদাওয়ার পালায় নামবি ? দুঃখ বেদনার বন্ধুর পথে আমিই তো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালনা করি। অভীঃ! অভীঃ! এগিয়ে যা! পথ আপনি দেখা দেবে। আমার ভালোবাসা কি কখনও বিফল হতে পারে ?......তোর এই ভালোবাসা কি সেই অনন্ত প্রেমেরই মৃদুতম কম্পন মাত্র নয় ? মনে রাখিস, কর্মণ্যেবাধি-কারস্তে, মা ফলেষু কদাচন। এ সংগ্রাম হয়তো তোরই কর্মফল। কেমন করে এর শেষ হবে, সেকথা জিজ্ঞাসার তোর কোনো অধিকার নেই। তোর ভালোবাসা তো আমার ভালোবাসার চেয়ে আলাদা কিছু নয়। আসলে এরা একই সত্য।'......কথাগুলি যখন মিলিয়ে গেল, তখন শ্রোতৃহৃদয়ের সামনে মাতৃময় এক মহাবিশ্ব দেখা দিল ;—

সে এমন এক ভালোবাসা, মানবী মায়েদের ভালোবাসা যার মৃদুতম আভাস মাত্র ;—দুঃখী অথবা সুখী সব জীবনই তখন বিশ্বজননীর সন্তানদের নিয়ে চিরন্তন খেলার লীলা।

* * *

সেইখানটিতে হাত রেখে প্রভু তাঁর ভক্তদের আশীর্বাদ করলেন।

'কালী দি মাদার' গ্রন্থের 'এ ভিজিট টু দক্ষিণেশ্বর'

তর্পণ*

(অনুবাদ : জগন্নাথ চক্রবর্তী)

হায়, নগরী এখন শূন্য, জনমুখর গৃহ নির্জন।...
নির্ঝরের উৎস শুষ্ক এবং দীপ নির্বাপিত!
হায়, অগ্নি নিঃশেষিত, এবং
ভস্মাবশেষ ছড়ানো অগ্ন্যাধারে!
হাতে গড়া মৃৎপাত্র স্বহস্তে চুরমার করে দিয়েছেন কুম্ভকার,
এবং মা-জননী অবগুণ্ঠনে আড়াল করে রেখেছেন
আমাদের প্রিয়তমের মুখ।

অন্ধ অমানিশা ও মত্ত প্রভঞ্জনে
গূঢ় শ্মশানভূমি,
গহন খরস্রোতা নদী ভাসিয়ে নিয়ে যায় নশ্বর ধূলিকণা।
কাল অনন্ত—লয়মান আত্মা সেই মহাকালের দিকেই দ্রুত ধাবমান,
মৃত্যুর করাল কর রোধে অক্ষম প্রেম
রোরুদ্যমান, অসহায়।

হে প্রিয়, আমাদের কাননে আজ পুষ্প ম্রিয়মাণ
এবং আমাদের সরোবর নিষ্পদ্ম।
আকাশে গীতিকণ্ঠ বিহঙ্গেরা আজ নীরব, এবং
তারকার মুখ ধূসর মেঘে আবৃত।
তোমার পদধূলি আর পড়বে না আমাদের গৃহদ্বারে
তোমার চোখের বিচ্ছুরিত দ্যুতি আর দেখতে পাবো না।

---

* অকাল-প্রয়াতা একটি ছোট্ট বালিকার উদ্দেশে।

(মৃতের উদ্দেশে)

এইমাত্র তুমি আমাদের মধ্যে ছিলে, এখনই ছেড়ে চলে গেলে,
তবু যেতে যেতে আরেকবার শোনো,
গ্রহণ করো আমাদের প্রণতি, আমাদের বিদায়-সম্ভাষণ !
তোমায় কতো আঘাত দিয়েছি, একলা রেখেছি,
কত ক্রোধ ও অধৈর্য দেখিয়েছি,
কতো ত্রুটি ঘটেছে আমাদের প্রেমে
এবং ভালোবেসেও তোমাকে মুখ ফুটে 'ভালোবাসি' বলতে পারিনি,
ক্ষমা করো !

জীবনে তোমার যা কিছু প্রয়োজন
মরণে তোমার যা কিছু প্রয়োজন
যে প্রেম তোমাকে ক্লান্ত করেছে
যে প্রেম তোমায় শুশ্রূষা দিতে পারে নি,
ক্ষমা করো !

তোমার মৃতদেহের পদমূলে এখানে
এই আমাদের স্মৃতিতর্পণ।
অনন্ত ভালোবাসায় আমরা মনে মনে
তোমার শৈশবের দিনগুলি যাপন করছি আবার।
একে একে তোমার দয়ার দান, তোমার শান্ত-মধুর
নিরহং-সাধনার ইতিবৃত্ত আমাদের মনে পড়ছে।
অপূর্ব আমাদের সহযাত্রার স্মৃতি !
মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ান তুমি এখন আমাদের পবিত্রতম।
তবু শোনো, হে আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রেমপুষ্পকলি, শোনো,
মৃত্যুর আধারে আবৃত যতদিন না আমরাও তোমার পাশে
নীত, শায়িত,

ততদিন আমাদের প্রেম, আমাদের প্রার্থনা
অবিরত ধাবিত রবে তোমার প্রতি।

শুনে রাখো, প্রেম মৃত্যুর মতোই অমোঘ—
শ্রাবণে অনির্বাণ, প্লাবনে অজেয়।
তোমার হাত আমরা ধরে আছি, ছাড়িনি,
তোমার নাম আমাদের হৃদয় থেকে হারিয়ে যায়নি ;
আমরা জানি, আমাদের এই প্রেম—বাসনা, কামনা, আকুতি—
কিছুই ফেলা যাবো না,
সব তোমাকে পাবে, তোমায় শক্তি দেবে—
ইহলোকে অথবা পরলোকে, ঈশ্বরের যা অভিরুচি।
প্রিয়তম, এখন বিশ্রাম করো, শান্ত হও।
তারপর নিদ্রাভঙ্গের পরে উঠে আমাদের সাথে প্রার্থনায়
যোগ দাও,
জীবনে, মৃত্যুকালে, অহরহ।

(পূজা)

হে ভীষণ তমিস্রা নিশা,
হে মায়ারাত্রি,
হে মৃত্যু নিশীথ,
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং
নমস্তুভ্যং নমোঽস্তুতে।
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য··· ॥
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।···
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়॥
ওঁ শান্তিঃ
হে প্রেতলোকের পুরুষেরা, তোমরা আমাদের পুরোবর্তী,
আমরা তোমাদের অনুগমন করছি।
হে মহান্ লোকান্তরিত, হে আনন্দঘন,
পৃথিবী যুগ যুগ ধরে মৃতের জন্য অশ্রুপাত করে এসেছে;
না, মৃতের জন্য অশ্রু নয়, অশ্রুপাত করো জীবিতদের জন্য,
কারণ তারা এখনো মৃত্যুপথগামী।

(মৃতের উদ্দেশে আশীর্বাণী)

প্রভু তোমায় আশীর্বাদ করুন, গ্রহণ করুন,
প্রভুর মুখমণ্ডলের আলোক তোমার উপর বর্ষিত হোক,
বর্ষিত হোক তাঁর করুণা।
তিনি তোমাকে শান্তি দিন,
তাঁর পবিত্রলোক থেকে তোমাকে সাহায্য করুন
স্বর্গীয় জেরুজালেম থেকে তোমায় শক্তি দিন
তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন
এবং তোমার মন ভরপুর হোক।

হে কৃষ্ণ, হে গোপাল,
হে বুদ্ধ, অনন্ত করুণাধার,
হে যীশু, আত্মার পরমাত্মীয়, ত্রাতা,
বিশ্বজননীর মুখশ্রীস্বরূপ হে রামকৃষ্ণ!
বিবেকানন্দ, হে বীরহৃদয়!
তোমরা এবং অনামা বিদেহী প্রভুরা,
দৈবকরুণার স্বপ্নরূপীরা,

এই আত্মাকে গ্রহণ করো, রক্ষা করো,
হে ঈশ্বর, প্রভু, তোমার আপন সান্নিধ্যে একে রাখো,
তোমার অনির্বাণ আলো একে আলোকিত করুক।

তারকাবিছানো পথে বেগে ধাও হে আত্মা নির্ভয়!
আশীর্বাদপূত যাও চিন্তা যেথা শৃঙ্খলিত নয়,
যেখানে চেতনা, কাল দৃষ্টিকে না করে আবরিত
অনন্ত করুণা শান্তি চিরদিন অঝোরে বর্ষিত।
সার্থক তোমার সেবা, পরিপূর্ণ তব আত্মাহুতি
অমর্ত্য প্রেমের নীড়ে চিরদিন হোক তব স্থিতি;
তোমার মধুর স্মৃতি দেশ কাল সব জয় ক'রে
নিবেদিত গোলাপের মতো থাক শূন্যস্থানে ভ'রে।
মুক্ত তব মোহবন্ধ, সিদ্ধকাম শান্তিতে শয়ান,
জন্মরূপী মৃত্যুরূপী ব্রহ্মে চির করো অবস্থান।
সেবাধর্মে নিয়োজিত মর্তভূমে চির স্বার্থহীন,
চলো চলো প্রেম দাও, ধরণীরে করো দ্বন্দ্বহীন।

অসৎ থেকে ওকে সত্যের পথে নিয়ে যাও,
অন্ধকার থেকে নাও আলোর পথে,
মৃত্যু থেকে নিয়ে যাও অমৃত-আলয়ে।

এই পৃথিবীর সর্বত্র তোমার গতি হোক।
হে রুদ্র, অবিদ্যা থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করো,
তোমার মধুর মুখমণ্ডল পৃথিবীর দিকে ফিরাও।
হে সর্বমঙ্গলদায়ক,
হে সর্বার্থসাধক, সর্বসিদ্ধিদাতা,
হে সর্বশুভঙ্কর,

নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং
নমস্তুভ্যং নমোঽস্তুতে।
হে ভীষণ তমিস্রা নিশা,
হে মায়ারাত্রি,
হে মৃত্যু নিশীথ,
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং
নমস্তুভ্যং নমোঽস্তুতে।

ভগিনী নিবেদিতার 'এন ইণ্ডিয়ান ষ্টাডি অফ লাভ এণ্ড ডেথ'-গ্রন্থের 'এন অফিস ফর দি ডেড্' কবিতার অনুবাদ। এ অনুবাদ মূল বইয়ের প্রথম ও পরবর্তী সংস্করণ মিলিয়ে রূপায়িত। 'তারকাবিছানো পথে⋯ দ্বন্দ্বহীন।'—এই অংশটুকুর মূলরূপ নিবেদিতার লেখা। বিবেকানন্দ-সংশোধিত রূপে বিবেকানন্দ-রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে। গুডইনের উদ্দেশে লেখা এই ইংরেজী কবিতাটির নাম 'Requiescat in Pace' বা 'শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম'। নিবেদিতা এ কবিতাটিকে তাঁর বৃহত্তর 'তর্পণ'-কবিতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আত্মা ও দয়িত

(অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ)

আত্মা :

…দীর্ঘ নীরবতা। নীরবতা আর নির্জনতা। তবু জানি, তিনি নেই এমন কোনো মহাশূন্যে আমি ছড়িয়ে পড়ি নি।…সবই এতো শান্ত! বেদীর সামনে বাতিগুলি জ্বলছে দূর নক্ষত্রের মতো। বাহির-বনানীতে শীতের কুঞ্জে ঝরে পড়ছে জীর্ণ পাতা। স্রোতোহীন ধূসর সাগর ভেঙে পড়ছে দীর্ঘ বলয়িত তটে। শুধু সময় চলে যায়, জ্যোতির্ময় সেই মুহূর্ত থেকে কেবলই দূরে নিয়ে যায় আমাকে। বিদায়ভূমি একদিন হয়ে ওঠে স্মৃতির মন্দির! ঝরে যায় একদিন শ্রুতির গভীর থেকে তাঁর স্বরগ্রাম, সে-দুই চোখের চাওয়া আর শিরোধার্য স্পর্শ তাঁর!……

না, ভেসে যাওয়া নয়। জিতে নিতে হবে সময়। হৃদয়ে ভালোবাসার অধিকার কি কেড়ে নেবে স্মৃতি? সব বাধা সরে যাবে; তিনি আমাকে ফেলে না গেলে যে-পথ হতো আমার, সে-জীবনই চাই।

অনির্বচনীয় মধুরিমা; তোমারই মধ্যে একদিন দেখেছি প্রিয়তম মুখচ্ছবি, আবার হৃদয়ে জাগো, অন্তরাত্মা যাঁকে চায় আবার তাঁকেই যেন দুই চোখে দেখি।

থেকে থেকে এ-কোন চেতনা হানা দেয়? যেন চুম্বকের টান, ক্রমেই সরে যাচ্ছি গভীর থেকে গভীরে। গহন, আরো গহন—অন্ধকার, আরো অন্ধকার—সমস্ত নিথর। নীরবতা তাঁরই অন্য নাম।

এই তো নিরবধির দেশ। অচঞ্চল, ধ্রুবস্থির, পরিবর্তনহীন। পৃথিবীকে স্বপ্ন মনে হয়। এ-বিশ্ব কোথায় আছে তবে?

উত্তর :

বিশ্ব, সে তো নিগূঢ় আত্মায়!

আত্মা :

হৃদয় ভরে উঠছে গাঢ়তম সুখে। আমি বুঝতে পারছি শেষ অবধি তাঁর কাছে পৌঁছব। তবু আমি শুনতে পাই না। তবু আমি দেখতে পাই না।

উত্তর :

শুনে নাও, অচিরেই ধ্বনিময় হয়ে উঠবে নীরবতা। দেখে নাও, অন্ধকার তো অদৃশ্য আলোক ছাড়া কিছু নয়। উল্লাসের সোপানে এসে দাঁড়িয়েছ। নিজেকে প্রণীত করো মহনীয় স্থিরতায়।

[সমস্ত শমিত। আবরণের পর আবরণ নেমে আসে হৃদয়ে। অবশেষে ব্যাপক আঁধার এক, তটরেখাহীন আঁধারসমুদ্র। আর এক নম্র ধীর কণ্ঠ শোনা যায়, যেন অন্ধকারের বুকের স্পন্দন !]

ওঁ! হরি ওঁ! অদ্বয় অসীম!

তৎ ত্বমসি! তৎ ত্বমসি!

অনুদ্বেল প্রশান্তিসাগর! সর্বময় হে পরিপূর্ণতা!

নিখিল প্রাণনা!

তৎ ত্বমসি! তৎ ত্বমসি!

সকল জ্ঞানের গূঢ় সকল প্রজ্ঞার মূলাধার। শাশ্বতের গহনে

ওঁ! হরি ওঁ! তৎ ত্বমসি!

[অপরিমেয় মাধুর্যে মূর্ছাহত হয়ে পড়ে আত্মা। দয়িত দেখেন তাঁকে, জাগিয়ে তোলেন তাঁর পদমূলে······

পরিব্যাপ্ত নীরবতা······আত্মা বলে :]

আ! এতোক্ষণে এই তো তোমার মুখ, গৌরবভাস্বর। সরিয়ে নিয়ো না আর, শোনো আমার মিনতি।

[আত্মার নিজেরই মধ্যে শোনা যায় দয়িতকণ্ঠ :]

বৎসে এসো তবে। উষার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উঠে যাই পর্বতশিখরে। অস্তবেলায় নেমে আসি নিবিড় বনানীতলে। এসো, কথা বলি।

এখানে অদ্বয় সব। দীর্ঘ বাক্য, ব্যাপ্ত দেখা এখানে অসম্ভব। এমন ভিন্নতা কিংবা বিচিত্রতা কল্পনারও অতীত এখানে।

আত্মা :

ভাবো এতোদিন ধরে তোমাকে খুঁজেছি শুধু শোকে, এখনো জানি না যে আমার মধ্যেই তুমি এসেছ।

দয়িত :

বোকা মেয়ে! কখনো কি তোমায় ছেড়ে দূরে ছিলাম আমি! এই তো তুমি হৃদয়েরও গভীর হৃদয়ে আমার সঙ্গে লীন। শুধু তোমারই প্রয়োজনে বাইরে এসেছিলাম, ভেঙে দিয়েছিলাম সংগীত মূর্ছনা······

আত্মা :

কী রকম জ্বলে উঠেছে তোমার মুখ! তোমার ললাটে ও কী জ্যোতির্মণ্ডল!

দয়িত :

ব্যক্ত জীবনের মধ্যে ওই হলো ঈশ্বরের প্রভা। আমার কাছেও তুমি আছো ওই একই জীবন-আলোকে।

আত্মা :

আর তোমার পশ্চাৎপটে গরীয়ান্ আলোকধারা ঊর্ধ্বে উঠে যায়, যেন তোমাকে আলোয় ধুইয়ে দেবে ঊর্ধ্বলোক থেকে।

দয়িত :

যা দেখো, সেতো তোমারই প্রেমের আলো। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার এই তো আলোকসেতু, আর তো কোথাও নয়। ভুলোনা এ প্রেম। মনে রেখো, বিরহ যে স্বপ্ন শুধু, আপাতবিচ্ছেদ। আমারই ভিতরে তুমি, তোমাতেই আমি।

আত্মা :

প্রিয় আমার! মহত্তম তুমি, তবু ভয়ংকর! তোমার স্নেহের স্বরে আমার সমস্ত সত্তা দগ্ধ হয়ে যায়। আবার জিতে যাচ্ছে সময়। ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি তোমার সন্নিধি থেকে।

দয়িত :

না, পরস্পরের জন্য ভিতরে সরে যাচ্ছি আমরা। মৃত্তিকার সংস্কারে তুমি ভারাক্রান্ত। অদ্বয় এই বেলাভূমিতে সময় তো শক্তি-হীন। দৃষ্টির এই নিবিড়তা তোমাতে চিরন্তন থাক।

ঈশ্বরসামীপ্যে নিত্য আমাকেই পাবে। আমারই হৃদয়ে তুমি শাশ্বতী হয়ে আছো। সমস্ত সময় তুমি আছো, সমস্ত সময়, সর্বকাল।

[দীর্ঘ সুপ্তি অবসানে আত্মা উঠে আসে, পৃথিবীর পথে চলে যায়, জায়মান শান্তি জেনে নেয়। প্রথমে সবাই ভাবে স্বপ্ন বুঝি। গহন দৃষ্টিই শুধু ঠিক সত্য জানে।]

'দি কম্যুনিয়ন অফ দি সোল উইথ দি বিলাভেড'—এ স্টাডি অফ ইণ্ডিয়ান লাভ অ্যাণ্ড ডেথ।

প্রেমের প্রার্থনা

(অনুবাদঃ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

নামরূপ থেকে বহু দূর সমূর্ধ্বে বিরাজো, প্রেম ;
যে-প্রেম বন্ধন করে নাশ,
যে প্রেম ঘোচায় সন্ত্রাস,
যে প্রেমে দেহের কোনো দাবি নেই,
প্রেম চিরন্তন, সর্বসীমান্তিক, বিশ্বজাগতিক,
শুদ্ধ হৃদয়ের প্রেম, সতত স্বমগ্ন রহে আত্মদীপালোকে,
আমাদের বিনতি তোমাকে।
তোমাকেই কারি নমস্কার,
তোমাকেই করি নমস্কার,
তোমাকেই করি নমস্কার।

মাতার দিব্যাবদান দুখানি কোমল ডানা
নিজেদের গভীর ছায়ায় ডেকে নেয়
যা-কিছু আলোক-ভয়ে অসহায়,
যতো শিশু কেঁদে ওঠে হারিয়ে গিয়েছে ব'লে,
ভ্রম, যতো পরাভব, পাপ, আর যতো মনস্তাপ,
বিজন বেদনা, সব অসংগতি, যতো
অনিকেত আত্মনিবেদন ;
হে পরম কারুণিক একে একে আমাদের তোমার নেপথ্যে তুলে
লহো,
আমাদের বিনতি তোমাকে।
তোমাকেই করি নমস্কার,

তোমাকেই করি নমস্কার,
তোমাকেই করি নমস্কার।

সুদৃপ্ত হে তরবারি নিরাবৃত পবিত্রতার,
যে-তুমি সকল বন্ধ করো ছারখার,
যে-তুমি অজ্ঞান করো নাশ,
যে-তুমি ঘোচাও প্রতিভাস,
সতত যদিও রহো নিজের ভিতরে,
পরাপ্রেম ব্যক্ত করে তোমার মহিমা,
সকল সংরাগ বুঝি পরিণতি লভে ভস্মশেষে।
অপূর্ব অনাত্মকেন্দ্র, সব শুদ্ধতার ভিত্তিবেদী,
তোমাকেই করি নমস্কার।
সত্তার মুক্তির ওগো প্রভঞ্জন,
অমর্ত্য পর্বতবায়ু,
আত্মসর্জনের তূর্ণ অস্থিরতা,
আমাদের বিশ্বময় আত্মপরিচয়,
প্রেমের সৌজন্যে ভালোবাসা,
কর্মের সৌজন্যে কর্মযোগ,
কিছু আশা না রেখেই ছেড়ে যাওয়া,
আমাদের বিনতি তোমাকে।
তোমাকেই করি নমস্কার,
তোমাকেই করি নমস্কার,
তোমাকেই করি নমস্কার।
যে-প্রেম সমূর্ধ্বশায়ী,
দুঃসহ মমতা শব্দাতীত,
দুর্বিষহ এক পবিত্রতা,
মুক্তি এক মুক্তি সে অমোঘ,

যে আলো দীপন আনে সর্বলোকে,
মধুর মধুরতম,
ভয়াল ভীষণতম,
আমাদের বিনতি তোমাকে।
তোমাকেই করি নমস্কার,
তোমাকেই করি নমস্কার,
তোমাকেই করি নমস্কার।
হে প্রেম অপরিমেয়, ব্যক্ত করো ঐ মুখ আমরা যেখানে,
হে প্রেম অপরিমেয়, বিরাজো জাগরতর আমাদের প্রাণে,
হে প্রেম অপরিমেয়, দগ্ধ করো যে-অবধি আমরা নিঃশেষ আত্মদানে।
আমাদের ইচ্ছা নয় তোমায় করবো অধিকার,
আমাদের ইচ্ছা নয় চক্ষু দিয়ে তোমাকে দেখার,
আমরা তোমার সঙ্গে হয়ে যেতে চাই একাকার।

'এ লিটানি অফ-লাভ : ইনভোকেশন' —অ্যান ইণ্ডিয়ান স্টাডি অফ লাভ অ্যাণ্ড ডেথ।

তুমি

(অনুবাদঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ)

সমস্ত সময় আমায় মনে রাখতে দাও ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতাই জীবনের একমাত্র অর্থ। দয়িত আমার সেই পরম দয়িত, যিনি শুধু এই জানালা দিয়ে চেয়ে আছেন। শুধু এই দুয়ারে করাঘাত করছেন। প্রেমময়ের তো কোনো অভাব নেই, তবু তিনি মানুষেরই মতো প্রার্থী হয়ে আসেন, যাতে তাঁর সেবার অধিকার পাই! কোনো আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই, তবু চাইতে আসেন যাতে আমার দেবার ভাগ্য হয়। আমায় ডাকেন, যাতে দুয়ার খুলে তাঁকে আশ্রয় দিতে পারি। ক্লান্ত হয়ে আসেন, যাতে বিশ্রামের আয়োজন করতে পারি। ভিখারীর সাজে এসে দাঁড়ান, যাতে আমি তাঁকে উজাড় করে দিতে পারি। ওগো প্রেমিক, ওগো দয়িত, আমার যা কিছু সে সবি তোমার। ওগো আমি সম্পূর্ণ তোমার। আমায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তুমি এসে দাঁড়াও। আমার 'আমি'কে একেবারে মুছে ফেলে 'তুমি' হয়ে ওঠো।

'দি বিলাভেড' : অ্যান ইণ্ডিয়ান স্টাডি অফ লাভ অ্যাণ্ড ডেথ।

প্রেমোদ্ভব

(অনুবাদ : প্রণবরঞ্জন ঘোষ)

হৃদয়ের সঙ্গে আজ আমার আলাপচারী। তার কাছে, আজ জানতে চাইবো, এই পৃথিবীতে কোন কোন সংকেত মিলিয়ে নিয়ে সে বুঝেছিল, কাকে বরণ করে নেবে আমার আত্মা।

তারা কি সেই সব নীরব সংকেত নয়, অন্যদের চোখে যা ধরা পড়ে না, আর সবাইকে যা এড়িয়ে যায়? শুধু আমার কাছে যাদের সীমাহীন মূল্য, কারণ আমারই অন্তরতম ভুবনে তারা ঢেউ তুলে যায়!

বাইরে থেকে আমাদের জীবন ছিল আলাদা। কিন্তু ভিতরে ছিল একের অনুভব: একজনের ঠিক সেইটুকু ছিল, যা আর একজন বুঝতে পারতো। একজনের ঠিক সেই ইচ্ছাটি ছিল, যার সঙ্গে আর একজনের ইচ্ছা সম্পূর্ণ মিলে যেত। যে আদর্শের আমি পূজারী ছিলাম, সে আদর্শ মূর্তিমন্ত হয়েছিল তাঁরই মধ্যে। আমি অনেক মহৎ স্বপ্ন দেখেছিলাম, তিনিই কি সেই সব স্বপ্নের দুরূহতম রূপায়ণ সাধন করেন নি?

এমন মুহূর্ত কি আসেনি, যখন দেহের বাতায়নে আমি শুভ্র-শিখার মতো সমুচ্ছ্রত সমুন্নত আত্মাকে দেখতে পেয়েছি? আর সেই মুহূর্তে প্রিয়তমকে আমি চিনেছি, জেনেছি—তিনি তো ক্ষতিই চেয়েছেন, লাভ নয়; দিতে চেয়েছেন, ফিরে চাইবার কথা ভাবেন নি; জয় করতে চেয়েছেন, অধিকার চান নি। আমি তাঁকে গ্রহণ করলুম আমার নেতারূপে, তাঁর ব্রতই হলো আমার ব্রত। আর জানলুম, আমি যখন তাঁর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করতে পারবো, কেবল তখনই বঞ্চিত ও নিপীড়িতের জন্য তাঁর সব কান্নার অংশভাক্ হবো।

এমনি সব আভাসে ইঙ্গিতে কোন সুদূর অতীতে অন্তরতম প্রিয়তমকে আমি চিনেছিলাম।

আজ চেয়ে-দেখার জগৎ থেকে অপসৃত বলে তিনি তো আলাদা কিছু নন। তাঁর জীবন ছিল আত্মার পূর্ণ পরিচয়ের জন্য উচ্চারিত সংহত একটি বাণী। প্রকাশের পরেও সে আত্মা তেমনি অখণ্ড-স্বরূপ।

এই মর্তলোকের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে যে কথা বলা তাঁর কঠিন ছিল, সেই অনুচ্চারিত অনুভব তো তাঁর অন্তর্লোকে কখনো কমে নি, বরং তারা দিনে দিনে পুষ্পিত হয়েছে!

তাঁর ভাবনার উত্তরে আমার ভাবনার যে উত্তর ভেসে যেত, সে উত্তর ভালোবাসার অন্তরতম বাণী, সে তো আজো তেমনি চির সত্য, তেমনি চির পূর্ণ।

তাহলে, তিনি যখন ঘুমিয়ে আছেন, তখন আমি তো জেগে থাকতে পারি প্রার্থনায়। অথবা অপেক্ষা করে থাকতে পারি, সে মহান নীরবতায় কখন আমিও তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাব!

'অফ লাভ': অ্যান ইণ্ডিয়ান স্টাডি অফ লাভ অ্যাণ্ড ডেথ।

পরম-মিলন-কথা

(অনুবাদ : প্রণবরঞ্জন ঘোষ)

তাঁকে জানা—প্রিয়তমকে জানার পথে অস্তিত্ব অনস্তিত্ব—সে তো একই সত্যের এপিঠ ওপিঠ।

একটিকে ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ। যদি দীর্ঘতর হতো অস্তিত্ব, হয়তো আমরা ভাবতাম সেই উপস্থিতি, সেই সান্নিধ্যই শেষ কথা। যারা এভাবে চিন্তা করে তারা প্রতারিত। শেষ লক্ষ্য—মিলন।

আর মিলন তো কোনো ঘটনা নয়। এক সুরে বাঁধা দুটি হৃদয়ের তা সহজাত ধর্ম।

আর সেই অনন্তসংগীত, যার স্পর্শে বীণার তারের মতো আমাদের সমস্ত সত্তা আঘাতে আঘাতে কেঁপে ওঠে, ভরে যায় মাধুর্যের ও পরমত্যাগের অনন্ত সুরসংগতিতে, সেই সংগীতকেই কেউ কেউ ঈশ্বর বলে জানে।

শুধু কেবল ঈশ্বরের মাধ্যমেই আমরা একে অন্যের কাছে পৌঁছতে পারি, এক হয়ে যেতে পারি।

তাই তো ইন্দ্রিয়-উপরতিই প্রেম। মৃত্যুর বিচ্ছেদেই প্রেমিকের কঠোরতম তপস্যা।

পরমতম এ তপস্যা, কারণ এ তো ঈশ্বরেরই দান।
অভীপ্সার এ বেদনা আমাদের উত্তীর্ণ করে নব নব চূড়ায়।
দুঃখ হয়ে ওঠে প্রেমের মুকুট।
আর প্রেম—পরিপূর্ণতার জন্য আনন্দ ও বেদনা দুইই তার প্রয়োজন।
কিন্তু সেই অভিষেকের পর দুঃখের স্থান প্রেমের চরণতলে।
তখন প্রেম অদ্বয় ভাস্বর।
আশীর্বাদধন্য হৃদয়! সেই তোমার ভালোবাসার চূড়ান্তজয়ের লগ্ন।

'অফ ট্রায়াম্ফান্ট ইউনিয়ন' : অ্যান ইণ্ডিয়ান স্টাডি অফ লাভ অ্যাণ্ড ডেথ।

অন্তরময়

(অনুবাদ : প্রণবরঞ্জন ঘোষ)

মৃত্যু সম্বন্ধে লোকশ্রুতির ভাবগুলিতে—হয়তো আমরা যা ভাবি, তার চেয়ে অনেক বেশী তত্ত্ব নিহিত।

মৃত্যুকে আমরা অনেকবার জেনেছি, জীবনকেও তাই।

অস্ফুট স্মৃতিরা স্বপ্নে হানা দেয়।

একটি বিপুল স্পন্দনের অন্তরালে যেমন ছোট ছোট অসংখ্য স্পন্দন এসে এক হয়ে মিশে যায়, তেমনি আত্মার গভীরে স্বচ্ছ কোনো মনের গহনে সংখ্যাতীত প্রয়াস ও অভিজ্ঞতার মিলিত সৃজন। অনেক সময়, অনিবার্য কোনো প্রকাশ আসলে আমাদের বিস্তৃত জ্ঞানেরই উদ্ভাসন।

তাছাড়া—

জীবনের গভীরে যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারশক্তি অমর্ত্যপ্রজ্ঞারই আর এক প্রকাশ। কারণ, নানা বিপরীতের অনিবার্য সমন্বয়েই অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে। আর সব অভিজ্ঞানের যিনি সাক্ষীস্বরূপ, তিনিই শাশ্বত আত্মা।

এখানে তাহলে নিয়ত বর্ধিষ্ণু ক্ষয় ও ক্লান্তি, ওখানে অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের চিরন্তন অনুভব। এখানে বহু, ওখানে এক।

তারপর—

অনুভবের এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উন্নীত হবার পথে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণার দল দেখা দেয়, তাদের পরস্পরের পার্থক্য কি আমরা বুঝতে শিখেছি?

দর্শনলাভের ব্যাকুলতার পরমলগ্নে আমার দেহলিতে তাঁর চরণপাত ঘটলো।

তাঁর অদর্শনে সমস্ত হৃদয় যখন অভিসারে ছুটে চলেছে, ঠিক

সেই মুহূর্তে হাতে এসে পৌঁছুল একটি চিঠি। অথবা তাঁর ভাবনা আমার ভাবনাকে স্পর্শ করলো।

অন্তরের অনুভবগুলির দিকে যাঁরা লক্ষ্য রাখেন, তাঁরা একথা জানেন। অদর্শনের বেদনা অনেক সময় উপস্থিতিরই অবগুণ্ঠিত প্রকাশ।

আর যদি সত্যিই সব কিছুর অন্তরালে এক পরম ঐক্য থাকে, তাহলে এই পরিণামই তো আমরা নিশ্চিত স্বীকার করে নিতে পারি। ইন্দ্রিয় আর তার বিষয়, বেদনা ও ঘটনা—এরা একই পর্যায়ের ক্রম-বিকাশ, একই সত্যের দুটি প্রকাশ মাত্র।

তাহলে, কী তাঁর বাণী?

তাঁর বাণী—শান্ত হও। শান্তিই চিরসত্য। একমাত্র শান্তিই সত্য। শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত যিনি, তিনিই শান্তিলাভ করেন। যার হৃদয়ে শান্তি নেই, সে কেবল বিকারকে দেখে, ভীষণকে দেখে।

ব্যথাহত হৃদয় আমার, শান্ত হও। তোমার প্রিয়তমের তো সবই কুশল। শান্ত হও, কারণ এখনো তোমার শান্তিই তাঁর পরম শ্রেয়ের সহায়। তোমার অন্তরের অন্তরতম প্রার্থনা তাঁর সঙ্গী হতে পারে। তাঁর উদ্দেশ্য আদর্শ তুমি এখনো পূর্ণ করতে পারো।

শান্ত হও। এও সত্য, এখনো তাঁর প্রশান্তি আলোড়িত করার শক্তি তোমার আছে। এই পৃথিবীর বুকে তোমার কান্নার সুরে এখনো তাঁর আনন্দময় চেতনায় বিক্ষোভ জাগতে পারে।

ভেবে দেখো, তোমার পাশটিতে যখন তিনি ছিলেন, তখন তিনি কেমন ছিলেন। তিনি কি তোমায় একা একলা হৃদয়ের কান্নায় ফেলে যেতে পারেন? তুমি কি কখনও তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারতে?

আর আজ যখন তিনি আরো শক্তিমান, আরো মুক্ত, আরো আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত, তখন এই পৃথিবীতে যে স্নেহ নম্রতা তাঁর ছিল, তা কি কখনো মুছে যেতে পারে?

শান্ত হও। আত্মার সেই অধিষ্ঠানে উপনীত হও, যেখানে

তোমরা এক। আত্মার তো কোনো সময়-সীমা নেই। যুগ থেকে যুগান্তরে তার মহান অভীষ্ট তীব্রতর শুভ্রতর শিখা হয়ে জ্বলতে থাকে। সেই ধ্যানই অনন্ত।

আত্মিক মিলনে প্রতিষ্ঠিত থাকাই বিশ্বস্ততা।

বিচ্ছেদ, শুধু সেই তপস্যা, যা একদা অতীত হয়ে যাবে।

আত্মা যখন আত্মার সঙ্গে এক হয়ে গেছে, বিদেহী সে মিলন তখন গভীরতম।

মহত্তর লক্ষ্যপথে যাত্রী হও। পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ প্রেমের ইতিহাসই অসংখ্য বিচ্ছেদে ভরা।

'অফ দি ইনার পারসেপসান' : অ্যান ইণ্ডিয়ান স্টাডি অফ লাভ অ্যাণ্ড ডেথ

চরণধ্বনি

(অনুবাদ : প্রণবরঞ্জন ঘোষ)

মাগো !

তোমার চরণধ্বনি ওই শোনা যায়
যুগ থেকে যুগান্তরে
ধরিত্রীর এখানে ওখানে স্পর্শ করে
ধীরে অতি ধীরে
তোমার চরণপদ্মে ফুটে উঠছে
বিশ্রুত ইতিহাসের নগরী,
প্রাচীনতম শাস্ত্র,
কবিতা,
মন্দির,
মহৎ প্রয়াস,
ন্যায়ের সংগ্রাম !

মাগো !

কোন্ লক্ষ্যপথে চলেছে ওরা
তোমার চরণচিহ্ন যত !
তাদের গভীরতম অর্থ
আমায় উপলব্ধি করতে দাও,
দাও সেই পরিব্যাপ্ত দিব্যদৃষ্টি,
আর মানব-ইতিহাসে তুঙ্গতম মননের অধিকার !

মাগো !

কোথায় চলেছে ওরা,
তোমার চরণচিহ্ন যত ?

আবির্ভূত হও,
  অয়ি মুক্তিদাত্রী জননী আমার!
    তোমারই তো স্নেহনীড়ে পালিত সন্তান আমরা,
      ওই চরণের পাদপীঠ হোক
        আমাদের সবার হৃদয়!
    অয়ি মাতা ভূমি দেবী,
      আমরা যে একান্ত তোমার!
    মাগো!
      কোন লক্ষ্যে চলেছে
        ওই চরণচিহ্নের পদাবলী যত!

'দি ফুটফল্‌স্‌ অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি' গ্রন্থের সূচনা কবিতা: 'দি ফুটফল্‌স্‌'

প্রজ্ঞা পারমিতা

শান্তি

স্বামী বিবেকানন্দ

(অনুবাদঃ স্বামী নিরাময়ানন্দ)

ওই দেখ—আসে মহাবেগে
মহাশক্তি, যাহা শক্তি নয়—
অন্ধকারে আলোক স্বরূপ,
তীব্রালোকে ছায়ার আভাস।

আনন্দ, যা হয়নি প্রকাশ,
অবেদিত দুঃখ সুগভীর,
অযাপিত অমৃত জীবন—
অশোচিত মৃত্যু সনাতন।

দুঃখ নয়, আনন্দও নয়,
তারি মাঝে জাগে অনুভব ;
রাত্রি নয়, উষাও সে নয়,
এ দুয়ের অন্তরের যোগ।

সঙ্গীতের মাঝে মধু সম—
সুপবিত্র ছন্দমাঝে যতি,
নীরবতা, কথার অন্তরে,
মাঝে দুই হৃদয়-উচ্ছ্বাস
চিত্তের পরমাশান্তি এযে !

অদেখা সে সৌন্দর্যসম্ভার,
সে যে প্রেম একাকী অদ্বয়,
অগীত সে জাগে মহাগান,
অজানিত পরিপূর্ণ জ্ঞান!

মৃত্যু দুই জীবনের ফাঁকে
স্তব্ধতা সে ঝঞ্ঝাদ্বয় মাঝে,
মহাশূন্য—যা হতে সৃজন,
সৃষ্টি ফেরে যেখানে আবার।

এরি লাগি ঝরে আঁখিজল,
সারা বিশ্বে হাসি ছড়াবারে,
এ যে শান্তি লক্ষ্য জীবনের
—একমাত্র নিশ্চিত আশ্রয়।

ভগিনী নিবেদিতার ব্রহ্মচারিণীবেশ ধারণ উপলক্ষে রচিত। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় ১৮৯৮-এর ২৫শে মার্চ বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়িতে তখনকার বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল্‌কে দীক্ষা দিয়ে 'নিবেদিতা' নাম দেন। পরের বছর ১৮৯৯-এর মার্চে তাঁকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করেন। ১৮৯৯-এর ২১শে সেপ্টেম্বর আমেরিকায় নিউইয়র্ক থেকে দেড়শ' মাইল দূরে মিঃ লেগেটের পল্লীভবন 'রিজলি ম্যানর'-এ নিবেদিতা ব্রহ্মচারিণীর উপযোগী বেশ ধারণের সঙ্কল্প স্বামীজীকে জানান। সেইদিন বিকালে ঐ সঙ্কল্প উপলক্ষে লেখা 'Peace' কবিতাটি নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকে উপহারস্বরূপ পেয়েছিলেন।

আশীর্বাদ

স্বামী বিবেকানন্দ

(অনুবাদ ঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ)

বীরের সঙ্কল্প আর মায়ের হৃদয়,
দক্ষিণের সমীরণ—মৃদু, মধুময়,
আর্য বেদীমূলে দীপ্ত হোমানল-মাঝে
যে পুণ্য সৌন্দর্য আর যে শৌর্য বিরাজে,
সে সব তোমারি হোক, আরো থাক তব
অতীতের স্বপ্নাতীত গুণ অভিনব।

ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা হও একাধারে!

১২শে সেপ্টেম্বর, ১৯০০ তারিখে ভগিনী নিবেদিতার উদ্দেশে লেখা।)

নিবেদিতার প্রতি

সুব্রহ্মণ্য ভারতী

(অনুবাদঃ যশোদাকান্ত রায়)

হে মাতঃ নিবেদিতা !
তুমি মন্দির, প্রেমবিগ্রহ
যেথায় অধিষ্ঠিতা।

রবিসম পরকাশি,
অন্তর হতে দূর করে দাও
ঘন তমিস্রারাশি।

বৃষ্টিধারার মত
শুষ্ক তৃষিত জীবন-মরুতে
ঢালো রস অবিরত।

কেউ নাই ভবে যার,
পথহারা যেবা, তুমি আছ চির
বান্ধবী সবাকার।

হোমাগ্নিশিখা সম
চির সত্যের স্ফুলিঙ্গ তুমি
বার বার নমো নম।

বিখ্যাত তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী ১৯০৫ খ্রীঃ-তে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস থেকে ফেরার পথে কলকাতায় ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে দেখা

করেন। স্বামীজীর এই মানসকন্যার সান্নিধ্যে আসার পর তাঁর কাছে জীবনের তিনটি লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—স্বাধীনতা, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ, এবং নারীজাতির মুক্তি। তিনি লিখেছেন—"মুহূর্ত মধ্যে কোনো কথা না বলেই তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন জগন্মাতার সেবার অর্থ কি এবং ত্যাগের মহিমা কী অপরিসীম।" ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি আধ্যাত্মিক গুরু এবং মহাশক্তিরূপিণী মনে করতেন। তাঁর দুখানি কাব্যগ্রন্থ 'স্বদেশ গীতাঞ্জলি' এবং 'জন্মভূমি' তিনি নিবেদিতাকে উৎসর্গ করেছিলেন।

(বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রকাশিত 'বিবেকদীপ' : বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৮৬ দ্রষ্টব্য)

নিবেদিতা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রসূতি না হ'য়ে কোলে পেয়েছিল পুত্র যশোমতী ;
তেমনি তোমারে পেয়ে হৃষ্ট হয়েছিল বঙ্গ অতি,
বিদেশিনী নিবেদিতা ! স্বাস্থ্য, সুখ, সম্পদ, তেয়াগি'
দীন দেশে ছিলে দীন ভাবে ; দুঃস্থ এ বঙ্গের লাগি'

সঁপেছিলে সর্বধন,—কায়, মন, বচন, আপন,—
ভাবের আবেশ ভরে,—করেছিলে আত্মনিবেদন।
ভালবেসে ভারতেরে কাছে এসেছিলে দূর হ'তে,
দিয়েছিলে স্নিগ্ধ ক'রে অনাবিল মমত্বের স্রোতে।

তপস্যার পুণ্য তেজে করেছিলে অসাধ্য-সাধন,
জ্বেলেছিলে স্বর্ণদীপ অন্ধকারে ; নব উদ্বোধন
করেছিলে জীর্ণ বিল্বমূলে মাতৃরূপা শকতির ;
স্মরিয়া সে সব কথা আজ শুধু চক্ষে বহে নীর।

এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়,
চলে গেলে অল্প-আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়,—
দেহ রাখি' শৈলমূলে ;—শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী ;
ওগো দেবতার দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী !

প্রেরণাময়ী নিবেদিতা

দিলীপকুমার রায়

তাদের কথায় কান দিতে নেই—পুঁথির বুলিই যারা মানে
জ্ঞানের চরম বাণী ব'লে—নেইকো যাদের পারের কড়ি—
দেউলে যারা আত্মবোধে—গর্বমোহ যাদের টানে
চোখবাঁধা বলদের ম'ত—ঘোরায় নাকে দিয়ে দড়ি।

সেই গল্প শোনো নি কি—একদা এক চক্ষুষ্মান্ সুপ্রভাতে
অজান্তে পা দিয়েছিলেন অন্ধদের বিচিত্র দেশে।
তাদের তিনি যতই বলেন: "ভগবানের আলো গাঁথে
সূর্যচন্দ্রতারার মালা"—গড়িয়ে পড়ে তারা হেসে।

সে-অন্ধদের রাজা বলে: "পাগল শুধু নয়ত এটা,
মিথ্যুকও—তাই গায়: "রূপ রং আলো উছল চলাচলে।"
কী আষাঢ়ে গল্প! দূর হ্ এক্ষুনি পাষণ্ড বেটা!
আমরা জন্মাবধি দুলি সুখেই মা তমসার কোলে।

"কী শান্তি যে পাই ছুটে রোজ মার অপরূপ কালো টানে;
মরি মরি!" বলেন তিনি: 'রং রূপ আলো ফক্কিকারি।'
অন্ধকারে হাৎড়ে চলার আনন্দের ও কীই বা জানে?
চিরনিশার সত্যলোকে এল কে বুজরুক ব্যাপারী?—

নিবেদিতা নানা বুদ্ধিমন্ত নাস্তিক ইঙ্গবঙ্গদের সঙ্গে লড়তেন ভারতের ভাবধারার সমর্থনে। তাঁর বহুদীপ্ত ভাষা থেকেই প্রেরণা পেয়েছি আমি ভারিত-ধর্মের। সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এ-তর্পণটি লেখা।

"জানে না যে য়ুং ফ্রয়েডের বুলি—সাইকো অ্যানালিটিক,
অটোসাজেশ্চন, রিপ্রেশন, হিস্টিরিয়ার ভাষ্যবাণী,
জানে না মুরুব্বিয়ানা অধ্যাপকী কি বৈজ্ঞানিক—
এমন মূর্খ তবু বলে কোন্ সাহসে : 'আমি জানি ?'

"কী জানে সে শুনি, বলে যে-গাধা, যে রূপ রং আছে ?
কেমন করে এমন কথা উচ্চারণ ও করল জিভে ?
ধিক ! যে রটায়—'মিশকালো এ বিশ্বে সাদা আলো রাজে !'
হয় দে ওকে অর্ধচন্দ্র, নয় ধর ওর গলা টিপে—

যাতে না ওর কথায় কেউ আর গাইতে পারে আলোর যত
রঙিন গুজব-রাগমালা। আমরা নবী, সত্যবাদী,
তাই পারি না কুসংস্কারের করতে পায়ে মাথা নত,
নাস্তি নিয়ন্তাকে দিতে অস্তির সম্রাট উপাধি।

যুগে যুগে এমনি মূঢ় গণমনের কণ্ঠ করে
অন্ধকারের জয়ধ্বনি ! তাদের মধ্যে থেকে থেকে
হঠাৎ যদি দু'চার জনের চোখ ফোটে হায়,—তারস্বরে
"চড়াও ওদের শূলে"—হাঁকে অন্ধরা একজোটে রেগে।

হাল আমলে বৈজ্ঞানিকের সংসদ আরও করল শুরু
সবজান্তা সিংহনাদে কীর্তিপ্রচার অজ্ঞতারি :
সে-কীর্তনে দিয়ে দোয়ার ভোটাররা সব করল গুরু
তাদের যারা ভোগের মন্ত্রী, বস্তুতন্ত্রী, হুহুঙ্কারী।

ধ্যান সমাধি গুরু দীক্ষা, ঘরছাড়া শ্যামলের বাঁশি
যাদের কানের মধ্যে দিয়ে পশেছে তৃষ্ণার্ত প্রাণে,

করেছে চাক্ষুষ যারা রোজ—ভক্তিবানে রাশি রাশি
অশান্তি উৎকণ্ঠা তমস্ যায় ভেসে তাঁর প্রেমবিধানে—

তাদের এরা "ভ্রান্ত" বলে, বলেছিল অন্ধ রাজা
যেমন তাকে, গেয়েছিল যে : "আছে রং আলো অপার" ;
দৃষ্টিহারার দল চিরদিন স্রষ্টাকে চায় দিতে সাজা
অন্ধতায় আনন্দী যারা চায় বন্‌তে কালাপাহাড়।

পেয়েছে তাঁর কৃপা যারা—যাঁর প্রসাদে মনের কালি
যায় ঘুচে এক পলে তাঁরি অনুকম্পার অবদানে,
ধূসরতার বালুচরে দেখল যারা রং সোনালি
তারা কী পায় দৃষ্টিবরে—শুধু দ্রষ্টা ঋষিই জানে।

বুদ্ধিমন্ত অধ্যাপকের স্ট্যাটিস্টিকী গজকাঠিতে
যায় মাপা যে-তথ্য তাদের বস্তুবিচার গবেষণার,
আছে মানি সার্থকতা বস্তুভিত্তি পৃথিবীতে,
কেবল এতে মন ভরে না অমৃতাশী নচিকেতার।

দুই আর দুই-য়ে চারের হিসেব চাই পাওয়া এ-মর্ত্যে, জানি
বৈজ্ঞানিকী বৃত্তিরাও বিধাতারই বিধান ধরায়।
যে-মাটিতে ঘর বাঁধি তার চাই বনেদের খবর, মানি।
তবু গৃহই শেষ লক্ষ্য নয় তো গৃহীর সৃষ্টিলীলায়।

গাইতেন শ্রীরামকৃষ্ণ : "জানে নি যে রামকে ভবে
কী জেনেছে সে-পণ্ডিত ?"* গায় বেদান্ত গভীর তানে :

* শ্রীরামকৃষ্ণ গাইতেন : "রামকো জো ন জানা সো ক্যা জানা হ্যায় রে ?" একথা শুনেছি আমার মাতামহ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের শ্রীমুখে—তিনি ঠাকুরের গলক্ষতের ওষুধ দিতে যেতেন দক্ষিণেশ্বরে।

"জানলে তাঁকে প্রাণ-সাধনায় তবেই জীবন সফল হবে,
'মহতী বিনষ্টি ভাগ্যে—না যদি পাও ভগবানে।"*

"অস্তি ভাতি প্রিয়" তিনি—জানে সে যে ভালোবাসে।
আলো সোনার শিখা হ'য়ে জ্বলে ব'লে মাটির দীপে
নয় তো মাটি শিখার সখী: অন্তরঙ্গ তার আকাশে
লক্ষ তারার দীপালিকা। শিবই করেন ধন্য জীবে

তাদের দিয়ে সুধাপরশ—তাঁর দর্শন যারা চেয়ে
মৃন্ময়ের আধারে করে চিন্ময়ের অচিন্ত্য বোধন—
তাদের কাছে প্রেমের ঠাকুর আসেন রূপের তরী বেয়ে
যে কাঁদে "দাও দেখা" বলে, তাকেই প্রেমে করেন বরণ।

বন্ধ্যা দর্প তর্কলোকে (বৈজ্ঞানিক বা অধ্যাপকের)
ওঠে না তো ঝলকে কৃষ্ণরাধার রাসের মর্মবাণী,
নয় প্রার্থী যারা—কেমন ক'রে পাবে নিত্যলোকের
খবর উগ্র হাঁকডাকে হায়? যারা অন্ধ অভিমানী

পারবে কেন চিনতে কালী দুর্গা রমা শ্যামলেরে
চির-আপন ব'লে? যারা অহঙ্কারে মেপে জুপে
চায় অতলের তল—আঁধারেই ঘুরে মরে মায়ার ফেরে—
সুর ছেড়ে অসুরকে ক'রে আরাধনা গন্ধে ধূপে।

দম্ভমোহে অন্ধ হ'য়ে করে তারা বুদ্ধিকেও
নাস্তিকতার জজ বা উকিল—যে কেবলই অসঙ্গতি

---

* "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।"

(কেন উপনিষদ)

দেখে বিশ্বে গর্জায় : "নেই ভবার্ণবে পারী কেহ,
বুদ্ধি যাকে বাতিল করে কোরো না তার পায়ে নতি।"

বুদ্ধি-হাতা দিয়ে কাজী চায়, হায় রে, ছাঁকতে সাগর,
কালো সাদা রূপ অরূপের সমীকরণ বোঝে না সে,
বুদ্ধির ক্ষীণ পাখায় উড়ে কে হয়েছে পার অম্বর ?
নাগাল কি সে পায় প্রেমলের—যে তাঁকে না ভালোবাসে ?

তাই ঋষি তাঁর সংজ্ঞা দিলেন মালা গেঁথে অসম্ভবের,
গেয়ে : "বিভু চল নিশ্চল, সসীম অসীম, দূরে কাছে,
যে করে জাঁক—জানে তাঁকে, পায় না দিশা নিরুদ্দেশের :
পায় না সে অই যখন শোনে—বিন্দুবুকেই সিন্ধু রাজে !

এ রহস্য বুদ্ধিমন্তের মনে হবেই কাব্য ধোঁয়া,
বলবেই সে : "নয় গ্রাহ্য ভাবতেও যা ধাঁধা লাগে,
দূর ! কেন তাঁর নাগাল চাওয়া দেন না যিনি ধরা ছোঁয়া ?"
বলেন জ্ঞানী : "সব ধোঁয়া হয় স্ফটিকস্বচ্ছ—যখন জাগে

দিব্যদৃষ্টি, দেখি তখন—মন মা কালী ভয়ঙ্করী,
ভয় ভরসা, জীবন মরণ তুফান তারায় তিনিই উছল,
বিষ সুধা হয় তাঁর প্রসাদেই, দীনের বুকেই দয়াল হরি,
কালো মেঘের বজ্রে বাজায় প্রেমমুরলী চিরশ্যামল।

"কাঞ্চন যে চায় না সে—অকিঞ্চনই পায় পরশমণি,
নিঃস্বের যে করে সেবা পায় সে প্রসাদ বিশ্বপতির,
পরার্থে যে স্বার্থ ভোলে—পরমার্থে হয় সে ধনী,
ক্লিষ্টকে যে দেয় কোল পায় সেই কোলে ঠাঁই মহেশ্বরীর।

ভোগবিলাসের রংমহলের দীপদুলালী সুনয়নী !
গুরুর মুখে সিন্ধুপারে শুনে মহান্ ত্যাগের গীতা
দিলে সাড়া এক নিমেষে, ফুটলে হ'য়ে প্রেমচারণী-
পুণ্যভূ ভারতের সেবায় আত্মহারা নিবেদিতা !

ভগ্নী নিবেদিতা

অমিয় চক্রবর্তী

যে উর্ধ্বে দীপ্তিলাগা প্রাণময় চৈতন্য তোমার
জ্বেলেছিলে পশ্চিম সংসারে
তারি শিখা নিয়ে এলে, ভগ্নী নিবেদিতা,
আর্যাবর্তে ; নীলিম সূর্যের বেদীতলে
দিব্য পুরুষের কণ্ঠে মন্ত্র শুনি পুণ্য ভারতীর
সারাজীবনের অর্ঘ্য রেখে গেলে ওইখানে
ধ্যানে কর্মে মুক্তযোগ, ঘরে ঘরে
বাংলাদেশ পেয়েছে তোমায় ॥

বিশ্বসমুদ্রের পারে পারে
মানবজাতির শ্রুতি যে ভাষার ঐকতলে জাগা
সেই আদি ভবিষ্যের ভাষা তুমি শুনে গঙ্গাতীরে
স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছ, কাহিনী-সংস্কৃতি-ইতিহাস
গেঁথেছ নবীন ধৃতি, ভারতীর চিত্রিত সাধনে
তোমার তীর্থের ধাপে ধাপে।

শৈল কৈলাসের
শ্বেতশ্যাম শীর্ষ হতে দূর কন্যাকুমারিকা
আসমুদ্র দৃষ্টি তুমি একটি আশ্রমের
মহান্ ঐশ্বর্যবৃত্তে করেছ বরণ—

তপস্বিনী, তোমারে মানসে
দ্বাদশ দেউল আর নতুন মন্দির সমর্পিত
যুগে যুগে আমাদেরি কালে—
চিরদিন সাম্প্রতিক : একই ধর্ম সেই
বিচিত্র মানবধর্মে জেনেছ একান্ত প্রকাশনী

ছবি জাগে কলকাতায়; শ্রীবিহীন গলির পাড়ায়
দুরূহ অস্তিক জীবনে
সম্মার্জনী হাতে তুমি স্তূপীকৃত মলিনতা
প্রত্যহ করেছ দূর, কারুণ্যে নিবিড়
প্রাণের সংগ্রামে নেমে গৃহস্থ সংসারে দুঃখবহ
জানালে গৌরব তবু, ভারতী বাঙালি
আপন মিলিত সৌধ গড়বে কোনদিন
নবীন স্বাধীন রাষ্ট্রে, সে আশ্বাস হারাও নি বুকে-
বিদায় নিয়েছ এই আদৃত দূরের স্বদেশে।

নিবেদিতা

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

তীর্থ করি একদিন জন্মভূমি, শরতের শুচিস্নাত এমনি প্রভাতে,
জন্ম নিলে মহাশ্বেতা, স্বর্ণঝরা সিন্ধুতটে ধরণীর জ্যোতিষ্ক-সভাতে
নিঃশ্রেয়স বাণীরে শুনাতে। মহীয়সী মার্গারেট! যাজক-দুহিতা তুমি,
কেল্টিক-শোণিতে গড়া আইরিশ বিপ্লবের পরিবেশে, এই দিনে চুমি
জন্ম-মৃত্তিকারে তব, আনন্দের অশ্রুসম স্যামুয়েল-পরিবারে এলে!
সপ্তর্ষি-মণ্ডল হ'তে নেমে এল দেবদূত, অগোচরে গেল দীপ জ্বেলে।
তাই আজি শরতের আগমনী সুরে সুরে কানে আসে পদধ্বনি নব,
বিবেক-স্বামীর জন্ম-জয়ন্তীর সমারোহ-ক্ষণে বাজে জয়-শঙ্খ তব।

সেদিন ভাবেনি কেহ সিন্ধু-পারাবারে হবে সেতু-বন্ধনের আয়োজন
কেন্দ্র করি তোমারে ভগিনি! পথে পথে অদ্বৈতের অমৃতের সত্যধন
বিলাইতে জনে জনে সেদিন এসেছে প্রভু সর্বধর্ম সমন্বয় করি—
'যত্র জীব তত্র শিব' শুনাতে সবারে বিশ্বে; তারি তরে চিরকাল ধরি
ছুটেছে কি সর্বজন অনন্তের পানে? শৈশবের খেলাঘরে স্বপ্নাবেশে
তুমি কি জেনেছ দূরে তোমার জীবন—কাব্য-মহিমার গৌরীশৃঙ্গে এসে,
প্রতিটি প্রভাত-সন্ধ্যা আলোর তুলিতে এঁকে করে যাবে পূর্ণ মনোরম,
দিব্যজ্যোতি দিবে আনি দূর করি সীমাহীন তমোরাশি! প্রচণ্ড নির্মম
যন্ত্র-সভ্যতার বৃদ্ধি-বিস্তারের পথ রুদ্ধ করি বিবেকানন্দের বাণী
শুনাইবে দিকে দিকে জীবনেরে করিতে নবীন আনন্দের ঊর্ধ্বস্তরে:
আবির্ভাব লাগি তব ভারতের নারীশক্তি দিবারাত্রি ডাকিছে ঈশ্বরে!

তুমি হবে কালজয়ী দেবতার শুচিস্মিতা অর্ঘ্যসম চির-অনিন্দিতা,
বোধির অতীতলোকে ভূমার সন্ধান লভি তুমি হবে মানস-দুহিতা

স্বামীজীর নিবেদিতা, রামকৃষ্ণ-সারদার বিশ্বোত্তীর্ণ লীলা-উদ্গাতা,
নিখিলের মহত্তম মহাকাব্য-নায়কের আনুকূল্যে হবে লোকমাতা
কোনোদিন করো নি কল্পনা। তুমি ছিলে সত্য-শিব-সুন্দরের ধ্যানে রত
কেদারবাহিনী-ধারা রুদ্ধ করি হৃদয়ের গঙ্গোত্রী গুহায়। ব্যথাহত
সংসারের বিপর্যয়ে তুমি ছিলে লণ্ডনের একপ্রান্তে শবরীর সম
যেন কার প্রতীক্ষায়। তাঁরি স্পর্শে পেয়ে কিগো কর্মভার নিলে সর্বোত্তম।
হিন্দু সভ্যতার আদর্শের অর্চনায় ছিলে শ্রান্তিহীন ; জ্ঞানভক্তি লয়ে
মন্ত্রসিদ্ধা হলে তপস্বিনী, পূর্বাকাশ তীরে শুকতারাটির মতো হয়ে।

আত্মার বিদ্যুৎদীপে বীর সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ লভি দেখেছিলে মায়া
মহামায়ারূপে আপনারে করেছে প্রকাশ ; ধরণীতে জাগে আলোছায়া
জন্মমৃত্যু মাঝখানে। যৌবন-মধ্যাহ্নে তব জীবনেরে দিয়ে গেলে ঢালি
ভারতের মুক্তি-তরে। উদগ্র সাধনা তব শ্মশানের বক্ষে চিতা জ্বালি।
ভক্তিবিশ্বাসের ধারা করেছ যে বহমান, রুদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা
কণ্ঠে বরি তপস্বিনী নিবেদিতা বৈরাগ্যের সাজায়েছ ত্যাগপুষ্পডালা
গুরুবন্দনার অনুরাগে। দৈবদত্ত মন্ত্রের সাধন তুমি আজীবন
ক'রে গেলে, শিক্ষা দিলে অগণিত মানুষেরে, নারীশক্তি করি উদ্বোধন,
গড়েছ যে প্রবুদ্ধ ভারত, জীবে সেবা করেছ যে শিবজ্ঞানে অবিরল,
দর্শনে মননে জ্ঞানে, ধ্যানে আর ধারণায় শুভকর্মে চিত্ত-শতদল
অহরহ ফুটেছে তোমার ; অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা তব ; বহ্নিবীজে উপাসনা
ক'রে গেছ মানুষের উজ্জীবন তরে, স্বর্ণরেণু ক'রে গেছ ধূলিকণা।

অজ্ঞতার অন্ধকারে যারা ছিল অন্তঃপুরে অর্ধমৃত অশ্রুজলে ভাসি,
অত্যাচারে লাঞ্ছনায় মৌন মূক, তাহাদের মুখে তুমি হাসি
ফুটায়েছে রাত্রিদিন, তোমার দরদীচিত্ত সর্বচিত্তে লভিয়াছে ঠাঁই,
তুমি আজ বহুদূরে, জ্যোতির্ময়ী নিবেদিতা, শ্রদ্ধাভক্তি তোমারে জানাই।

'উদ্বোধন'-পত্রিকার সৌজন্যে

নিবেদিতা

স্বামী নিরাময়ানন্দ

সুন্দর নির্মল শুভ্র প্রস্ফুটিত মুগ্ধ পুষ্পসম
উষার প্রথম সাথী শুকতারা শান্তিস্নিগ্ধতম।
অন্ধ রুদ্ধ রাত্রিশেষে, আলোকের তুমি অগ্রদূত
দেবীপদে নিবেদিতা তুমি দেবী অপূর্ব অদ্ভুত।

প্রথম উষার যাত্রী আধো আলো আধো অন্ধকারে,
পরাণে বিশ্বাস আশা, পথভরা কণ্টকে কঙ্করে।
ক্ষীণতনু শুভ্র শান্ত, রক্তহীন—শুধু শক্তিভরা
পার্বত্য তীর্থের যাত্রী চলিয়াছ—দেখি ক্লান্তিহরা।

যোদ্ধা তুমি, বক্ষে তব ধ্বনিতেছে সৈন্যের সাধনা,
চক্ষে তব উছলিছে বিদ্রোহী ও কবির কল্পনা।
হে দেবী, তোমার যুদ্ধ একাকিনী দুঃখদৈন্য সাথে,
সে যুদ্ধ-কাহিনী তব থাক ভরা মৌন বেদনাতে।
আঁধারের সাথে যুদ্ধ আলোকের মুক্তি পিপাসায়
তাহারি ঝঙ্কার বাজে দেবী, তব জীবন-গাথায়।

হে তাপসী, কবে কোথা কোন দিন উঠিল জাগিয়া
অন্তরে পিপাসা তব অনন্তের আলোক লাগিয়া?
কেন সে উঠিল জাগি সুখতন্দ্রা ছাড়িয়া মধুর,
শান্ত কেন হ'ল না সে বিলাসের বক্ষে সুখাতুর?
অনন্ত ঐশ্বর্য মাঝে তৃপ্ত কেন হ'ল নাকো প্রাণ?
কী টানে টানিলে দেবী ভারতের দারিদ্র্য মহান?

তুমি বুঝি ভারতের শাপভ্রষ্টা তাপসী তনয়া
তাই তব তার তরে এত মায়া এত স্নেহ দয়া ?
তাই বুঝি সে বন্ধন জন্ম হতে যায় জন্মান্তরে
রুধিয়া রাখিতে নারে দেশান্তরে পর্বতে সাগরে।
পথ ভুলে গিয়াছিলে অতি দূর পশ্চিম প্রবাসে,
অথবা মিলনছলে দেবতার লীলার বিলাসে
আধ তব অনিচ্ছায়, হয়ত বা আধেক ইচ্ছায়,
ভারতের লাগি তুমি ভাবময়ি আসিলে ধরায়।

শৈশবে কৈশোরে কভু কতদিন পড়িয়াছে মনে
বিস্মৃত জীবনকথা ধরা দিত নিশীথ স্বপনে।
তারপর প্রেমময় জ্ঞানসূর্য যবে দেখা দিল
হৃদয়-নন্দন-বনে পারিজাত ফুটিয়া উঠিল।
সযতনে সঙ্গোপনে অন্তরের সেই অর্ঘ্য নিয়া
সুদূর পশ্চিম হতে জাতিকুলে জলাঞ্জলি দিয়া
এলে তুমি, ভারতের বেদীমূলে হলে সমর্পিতা।
বিজয়িনি, হে বিজিতা, দেবী তুমি, তুমি নিবেদিতা।

'ভারত ভারত' তব জপমন্ত্র ছিল অনিবার
জানিনা দেখিয়াছিলে কী নয়নে কী মূরতি তাঁর !
তুষারমণ্ডিত তাঁর হিমালয়ে ধূসর জটায়—
দিগন্তবিস্তারী তার শ্যামলিমা সুনীল ছটায়—
কলহাস্যমুখরিত চল চল তরঙ্গিণীকূলে
অথবা শীতলছায়ে সুবিশাল বিটপীর মূলে
জানি না নীরব নেত্রে কী দেখিতে কী ভাবিতে তুমি
হয়ত স্বপ্নের মত মনে হত 'প্রিয় জন্মভূমি' !

তুমি কি ভাবিয়াছিলে ভারতের প্রতি দিকে দিকে
দেবতারা খেলা করে ?   শিব ভালোবাসিছে গৌরীকে ?

বুদ্ধ আজো ধ্যানে বসি ফল্গুতীরে বোধিদ্রুমতলে ?
ইন্দ্র আজো বৃত্রাসুরে বজ্র হানে দধিচীর বলে ?
তুমি কি ভাবিয়াছিলে ভারতের অরণ্যের মাঝে
ঋষিদের বেদগান সন্ধ্যারাগে সামসুরে বাজে ?
আজো বুঝি জনকের জ্ঞানগর্ভ মহতী সভায়,
গার্গী ওঠে ব্রহ্মবাদে পরাজিত দেখিয়া সবায় !
তুমি বুঝি ভেবেছিলে আজো সেই যমুনার তীরে
গোপালনন্দন কৃষ্ণ বেণু লয়ে ধেনু লয়ে ফিরে ?
আজিও ডাকিয়া যায় বংশীধ্বনি মিলন-সঙ্কেতে
কখনো শঙ্খের ধ্বনি লয় টানি মরণ-অঙ্কেতে ?
তুমি কি দেখিয়াছিলে—ভারতের অণু পরমাণু
গিরিগুহা শিখর প্রান্তর নদনদী বন স্থাণু
সবি দেবময় ! ভারতের কৃশ নগ্ন অর্ধমৃত
জীবচয়—তারাও দেবতা তব হ'ল নির্বাচিত ।
হে দেবি, জীবন দিয়া—দিব্য তব নব দৃষ্টি দিয়া
মৃত এ সুপ্তির মাঝে নব সৃষ্টি গিয়েছ আঁকিয়া ।
তোমার মোহনমন্ত্রে সুকঠোর ঝঙ্কারে আঘাতে
জাগাইয়া যাও আজ, ভারতের প্রাণের বীণাতে
নবযুগ জীবনের মহামন্ত্র অন্তরে বাজাও,
তোমারি দেবতা লাগি এ মন্দির সাজাইয়া যাও
অম্লান কুসুমমালা দিকে দিকে কর প্রস্ফুটিতা
দেবতা-চরণতলে হোক তারা চির নিবেদিতা ।

জননী নিবেদিতা

বনফুল

আলো, হাওয়া, গন্ধ, রূপ, সুর, স্বপ্ন
বিশেষ কোনও দেশের সম্পত্তি নয়।
এরা সর্বকালের, সর্বদেশের সর্বমানবের।
এদের মহিমা
স্পর্শ করে সকলকে
ধন্য করে, মুগ্ধ করে, পবিত্র করে।
মা-ও তেমনি।
মায়েরাও সব দেশেই প্রসারিত করে রেখেছেন
সেই মাতৃ-হৃদয়
যার কাছে ঋণী সমস্ত মানব-সন্তান,
সন্তানের মঙ্গলের জন্য যা
নিজেকে অহরহ নানা রূপে রূপায়িত করছে,
যা
কখনও নদী, কখনও পর্বত, কখনও আকাশ,
আলো হাওয়া গন্ধ রূপের বৈচিত্র্যে
যা অনবদ্য, অপরূপ, নিত্য নব রূপান্বিত
কিন্তু আসলে, যা মাতৃহৃদয়
যা সর্বকালের, সর্বদেশের, সর্বমানবের
রক্ষয়িত্রী, পালয়িত্রী, মাতৃমহিমা।
মহীয়সী নারীরা সবাই মা।
ওগো বিদেশ-নন্দিনী নিবেদিতা,
তাই তুমি আমাদের দেশে বেমানান হওনি,

যারা নাম দিয়েছিল ভগিনী নিবেদিতা
(খৃষ্টান মিশনারিদের নকলে)
জানি না তারা জানত কিনা
যে ভগিনীর অন্তর-সিংহাসনে
সমাসীন আছেন সেই চিরন্তনী জননী
যিনি সন্তান শুভাকাঙ্ক্ষিণী,
যিনি সেই মহাপ্রেমের প্রতীক
যে প্রেম শ্যামল করে ঊষর মরুকে,
যার স্পর্শে
কণ্টক রূপায়িত হয় পুষ্পে,
যা অহরহ নিজেকে বিলিয়ে দিয়েও
নিঃশেষ হয় না,
হয় আরও প্রসারিত, আরও প্রস্ফুটিত,
সাগর হয় মহাসাগর,
সামান্য সুখ অসীম তৃপ্তির আনন্দে
বিলীন হয় ভূমার অনন্ত ব্যাপ্তিতে।
সেই জননী নিবেদিতা
ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মূর্ত আজ।
তাঁকে সহস্র প্রণাম জানাই।

নিবেদিতা

বিমলচন্দ্র ঘোষ

বৈখরী মধ্যমা সূক্ষ্মা পশ্যন্তী যেথানে
অর্থময়ী শ্রোত্রগ্রাহ্যা চতুর্বিধ বাক্যস্বরূপিনী
মননসঞ্জাত শব্দে চৈতন্যসঞ্চারে
প্রজ্ঞায় বিধৃত আমি সে বাঙ্ময়ী বাসনাকে চিনি।

জাতিশব্দে গুণশব্দে ক্রিয়াশব্দে দ্রব্যশব্দে যার
বহুবর্ণ মানচিত্রে ভৌগোলিক জাতীয় ঝঙ্কার
বহিরঙ্গে রূপায়ণী অন্তরঙ্গে ভূমাবিভূষণা
সৃজনে সংবর্তে দ্বন্দ্বে বিশ্বরূপা সে মায়াকে চিনি।

এক দেশ অন্যদেশে যে দুর্বার প্রবুদ্ধ আবেগে
অনন্ত আত্মার যোগে মৈত্রীবদ্ধ অবলীলাক্রমে
আত্মবোধে মেধা মনীষায়,
মহাদূতী তার
লোকসংঘে সংঘমিত্রা প্রজ্ঞাপারমিতা
বিকাশে উন্মেষে জ্যোতির্ময়ী।

আমি তার তন্ত্রধার চেনার চৈতন্যে উদ্ভাসিত
চলমান শতকের অশ্রুলালিত
ক্ষুব্ধ এক লোককবি,
আমি তার মূর্তছন্দ লোক-বন্দনার।
লোকমাতা নিবেদিতা,

সবিস্ময়ে সকৃতজ্ঞ দেখেছি তোমায়
লোকপ্রেমে ভাবসমুত্থিতা
শুনেছি তোমার
দুরন্ত আইরিশ রক্তে গম্ভীর গাঙ্গেয় কলগান।

নিবেদিতার প্রতি

সুনীলচন্দ্র সরকার

দুই ভ্রাম্যমাণ তারা কখনো কখনো
আকাশের অনন্তবিস্তারে
পরস্পর দেখা পেতে পারে।
কিছুটা বিস্ময়, হয়তো ক্ষণিকের বিপ্রতীপ ঝোঁক-
একাকিত্ব হারানোর শোক—
তারপর নিয়তির অলঙ্ঘ্য ইশারা
তাদের বানায় যুগ্মতারা।

আইরিশ বিদূষী তুমি উজ্জ্বলযৌবনা,
ইয়োরোপের সংস্কৃতি সাধনা
সম্পূর্ণ মন্থন করে আত্মার অমৃত
সেথা পাও নি তো।
পথবন্ধু খুঁজেছিলে নিজের দেশের পরিবেশে,
পেলে না তা, সেই বন্ধু
দেখা দিল প্রাচ্যসাধুবেশে।

তারপর ভারতমৃত্তিতে নেমে নিলে এক
নতুন নিশ্বাস
বুকের সমস্ত ভ'রে 'ওঁ তৎ সৎ'
অদ্বিতীয় একের বিশ্বাস ;
গঙ্গাতীরে কুটিরের নিঃস্ব অকিঞ্চনে
মহামানবিক সিদ্ধি চিনে নিয়ে এঁকে নিলে মনে।

বদরিকা পথে হিমালয়
স্নেহ উপহার দিল অভীপ্সার উত্তুঙ্গ বিস্ময়।
সেখানে দেখালে তুমি সেবাকর্ম কল্যাণনিপুণা
ভারতের নারীর নমুনা।

চোখে মুছে পশ্চিমা কাজল
মানলে আপন ব'লে এদেশের জীব, মাটি, জল…
স্বদেশের জন্মবিদেশিনী, শেষে তুমি
ভারতেই পেলে জন্মভূমি।
আর পেলে প্রজ্ঞানেত্রে ভেদ ক'রে বাহির বর্ণালি
ভারতীয় কালী।
সে মূর্তিতে চিনে নিলে অনন্তের
নগ্ননীল নাচের উৎসব
এবং হৃদয়ে তার অসংশয় মাতৃ অনুভব।
জন্মশতবর্ষদিনে জ্যোতিপরিবৃতা
এ কবিপ্রণাম নাও দেবী নিবেদিতা।

নিবেদিতা

সুশীল রায়

যদি করা যায় দূর অন্ধকারাচ্ছন্ন কুজ্ঝটিকা
সেজন্য কে জ্বেলেছিল পরিচ্ছন্ন শান্ত শুভ্র শিখা ?
বহুদূর দেশ থেকে এসে কে যে হয়েছে আপন,
জনতার সঙ্গে মিশে কে হয়েছে জনসাধারণ ?
এ অসাধারণ ব্রত উদ্‌যাপনই ছিল যার ব্রত,
তার কথা কখনোই বিস্মৃত হব না সম্ভবত।

নিভৃত নেপথ্যে বসে যারা ধ্যান করে তারা করে
আপন কল্যাণ মাত্র, করে সকলের অগোচরে।
নিজের কল্যাণ নয়, মানবকল্যাণ ইচ্ছা যার
স্বার্থহীন সেই সেবাব্রত ছিল একান্ত তোমার।

আলো হাতে এলে তুমি, যারা সব সাধারণ লোক
তারা পেয়ে গেল চোখে সহসাই আশ্চর্য আলোক।
স্বদেশ বিদেশ বলে বাঁধো নি তো কোনোই সীমানা,
কিছুটা জেনেছি বটে, সবটুকু তবুও অজানা।
কোন দূর দেশ থেকে কোন বীজ এনেছ এখানে
ফুলের ফসল এলো আমাদের স্তিমিত বাগানে॥

স্মৃতি-তর্পণ

বীণাপাণি বসু রায়

নিবেদিত জীবনের অর্ঘ্যপাত্র হতে
কুসুম চয়ন করি মম সাধ্যমতে,
স্মৃতি-আরাধনা লাগি মালা গাঁথি তার
নিবেদন করি দেবী—উদ্দেশে তোমার।
সুদূর সাগর পারে শীতের সন্ধ্যায়
আচার্য দর্শন লাভ প্রথম ধরায়।
গৈরিক বসনধারী আত্মসমাহিত
বিবেকানন্দ যতি। হতেছে ধ্বনিত
'শিব' নাম অচঞ্চল শান্ত কণ্ঠস্বরে।
অমর্ত্যের দিব্যজ্যোতি ললাটের 'পরে
রহিয়াছে মূর্ত হয়ে। পরম সে ক্ষণে
'মার্গারেট'—জন্মান্তর লভিলেন মনে।
সন্ন্যাসীর উদাত্ত আহ্বান প্রবেশিল
অন্তরের অন্তঃস্থলে। যাহা কিছু ছিল
একান্ত আপন তাঁর—প্রিয় পরিজন,
আজন্মের পরিচিত আত্মীয় স্বজন,
আবাল্যের শতেক সংস্কার, নিজ দেশ
চির আকাঙ্ক্ষিত গৃহ কর্মপরিবেশ—
ত্যাগ করি চলিলেন ভারতের তরে
স্বামীজীর দিব্যাশিস্ ধরি শির 'পরে—
"আমরণ রহিবেন সাথে এ ধরায়
কর্মে, কর্ম-অবসানে—আশা নিরাশায়।"

চিহ্নিত দিবস সে যে সোনার অক্ষরে
'জননীর' কৃপাদৃষ্টি যেদিন অন্তরে
লভিয়া আনন্দে গেছে হৃদয় ভরিয়া।
'মা' তাঁহারে নিয়াছেন আপন করিয়া—
কল্যাণ কোমল করে স্পর্শ করি তাঁরে
আশীর্বাদ দিয়াছেন প্রণতা কন্যারে,
পুণ্য জাহ্নবীর কূলে পূত পরিবেশ
দীক্ষা লাভ হল তাঁর। নিজেরে নিঃশেষে
করিলেন সমর্পণ। ইষ্টদেবতারে
নিবেদন করি, গুরু নাম দেন তারে—
'নিবেদিতা'—দেহে মনে ধ্যানে ও চিন্তায়
নিবেদিতা—সর্বকর্মে সব তপস্যায়।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিয়া পরিশ্রম কত
করিছেন হাসিমুখে। ক্লেশ দুঃখ শত
সহিছেন—ভারতী কল্যাণব্রত তরে।
আলোহীন বায়ুহীন অন্ধকার ঘরে
অর্ধাশনে অনশনে দিন যায় তাঁর।
ক্লান্তিহীন লেখনীতে রচনা সম্ভার
নিয়ত বাড়িয়া উঠে। আপনার কথা
ক্ষুধা তৃষ্ণা—ভাবিবার অবসর কোথা?

সহসা পশিল আর্তক্রন্দনের ধ্বনি
অন্তরে—শিহরি উঠি রাখিয়া লেখনী
চলিলেন—মৃত্যু যেথা দাঁড়ায়েছে আসি
বালিকা-শিয়রে। নয়নের জলে ভাসি'
ব্যাকুলা জননী খোঁজে তাহার কন্যারে।
পাশে বসি ধীরস্বরে বলিলেন তারে—

"মহামায়া নিয়াছেন তনয়া তোমার,
শান্ত হও—মার কোলে সন্তান তাঁহার।"
কি জানি কি ছিল সেই শান্ত কণ্ঠস্বরে
জননী সান্ত্বনা লভে শোকার্ত অন্তরে!

ভারতে বাসিয়া ভাল আপনার করে
নিয়েছেন তারে—তাই তার তরে
অন্তরাত্মা কাঁদিয়াছে—পরাধীনতার
ব্যথা বাজিয়াছে বুকে। সবদিকে তার
সজাগ সস্নেহ দৃষ্টি—তার ইতিবৃত্ত
শিল্পকলা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য
তারি দানে নবজন্ম যেন লভেছিল।
আন্তরিক যোগাযোগ গড়িয়া উঠিল
ভারতের মনীষী ও গুরুজন সাথে—
কত চিন্তা আলোচনা নিত্য দিনে রাতে।

জীবনের সায়াহ্নে তাঁর হিম শৈলাবাসে
শেষ হল সর্বসমর্পণ। শেষ শ্বাসে
নূতন আশার বাণী উচ্চারণ করি
ডুবে গেল চিরতরে জীবনের তরী।
পূর্ণ হল এ জন্মের ব্রত উদ্‌যাপন
আপনারে নিবেদন হল সমাপন।

'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়'-পত্রিকার সৌজন্যে

ভগিনী নিবেদিতা

পুষ্পদেবী

বিবেকানন্দ-মানস-তনয়া সাগরের পার হতে
নিজ হাতে তুলি যেই শতদল নিবেদিল ভারতেতে
সৌরভে ভরে দিক
সকলে নির্নিমিখ
সোনার কমল অজস্র দল অজস্র গুণে ভরা
ত্যাগে মহিমায় করুণা দীপ্তি সব একত্র করা।

আর্তজনের মূর্ত জননী বিগলিত স্নেহ ঝরে,
দেবীর মূরতি তোমার আরতি আজো কত জনে করে,
আঁখি মোর ভরে জলে
হৃদয় পদ্মদলে
জপমালা হাতে কন্যাকুমারী দেবী মূরতির প্রায়
তোমার মূরতি দেবী-রূপে শোভে ভারতের আঙিনায়!

কত ভালোবেসে পরদেশে এসে আপনারে সঁপে দিলে
দুঃস্থ দুঃখী অন্যায় যেথা সেথা নিজে ঠাঁই নিলে
জানিনা মন্ত্র তব
পূজা তব অভিনব
দীপ্ত শাণিত তরবারি সম ঝলকিয়া উঠে দেখি
যেথা অন্যায় মিথ্যা যেথায় অগ্নির সম এ কী?

শ্রীঅরবিন্দ হয়েছে ধন্য পিয়ে ও পীযূষধারা,
বিপ্লবী যত দেশের ছেলেরা মায়েরে পাইল তারা,
তোমার কীর্তি যত
ভাষা লাজে মাথা নত
মুক্তি সাধক বিবেকানন্দ, মায়ের চরণ 'পরে
দিলো যে অর্ঘ্য নিবেদিয়া তারি সৌরভে দিক ভরে।

মহাসমাধির আগের দিনেতে গুরু তব স্নেহভরে
আপনি হাতেতে দিল জল ঢেলে কত না করুণা করে
বোঝনি মা তাঁর কথা
তব তরে ব্যাকুলতা
আপনার যাহা শকতি ও তেজ নিঃশেষে তোমা দিল।
ভারতেরি মেয়ে ভিনদেশে যেন ভুল করে জনমিল।

আজ তব কথা কহিতে জননী ভাষা মোর হেরে যায়
দুঃখী ভারত আজো কেঁদে কেঁদে তোমারে আবার চায়
স্বাধীন দেশেতে আজ
অনাচার শত লাজ
তোমার মতন করিয়া এমন কে দাঁড়াবে ভালোবেসে,
বক্ষেতে ভরা বজ্রের তেজ স্নেহেতে মধুর হেসে।

নিবেদিতার ঘর

হরপ্রসাদ মিত্র

আলোতে আর অন্ধকারে খচিত বিস্তারে
কতো যে তরুলতার বীথি পেরিয়ে বারেবারে
কতো যে রোগশোকের পথে কেবলি আসা-যাওয়া
তবু তো সরোবরের ফুলে লাগে ভোরের হাওয়া!
সূর্যোদয় ঘটেই রোজ যতোই থাক মেঘ,
প্রাণের গতি নিরন্তরা,—সে নয় নিরাবেগ।

তোমার সেই আবেগ লেগে যদি জীবনবোধ
পূর্ণ হতো, পুণ্য হতো, তাহলে মরলোক
অন্য স্বাদে ধন্য হোতো যেমন হাসিমুখে,
অটুট ছিলে অকুতোভয়া স্বাধীনতার সুখে।

আমরা যারা ইতিহাসের আর এক বাঁকে আজ
শতশৃঙ্গ শতাব্দীকে হীরে-মোতির তাজ
পরাই কী যে আড়ম্বরে বক্তৃতায়, গানে—
অথচ যারা বিদ্যমান ভিন্ন মূল্যমানে—

প্রণতি নেবে তাদেরও তুমি? মেলে না উত্তর—
নির্বাণের নির্বচনই নিবেদিতার ঘর।

নিবেদিতা

বাণী রায়

নিবেদিতা ! নিবেদিতা !
বিদীর্ণ প্রহর
মর্ম চিরে তোলে ধ্বনি বিগতদিনের :
একটি নামের সোনা
আলোকিত করে অন্ধকার জমা তাল,
শিহরিত কাল ।
গভীর সমুদ্র স্তব্ধ কুমারিকা দ্বীপে
বিবেকানন্দের শিলা ;
তিনটি সাগর
পূর্ব ও পশ্চিম আর দক্ষিণ বাহিনী,
ধ্যান স্বপ্ন শিলীভূত ;
তরঙ্গ-উত্তাল মত্ত
সাগর সঙ্গম,
খ'সে পড়ে যুগান্তের জাড্য আর তমো,
সেখানেও শুনেছি এ ডাক—
নিবেদিতা, ফিরে এসো ।
ধ্যানমূর্তি ধরো প্রতি ভারতের ঘরে,
ভারতের মেয়ে
আরবার সোনা হোক ।
শস্যের সুঘ্রাণে প্রতীক্ষু ধরিত্রী বেয়ে
এসো, সোনা মেয়ে ।
নিবেদিতা ! নিবেদিতা !

বিবেকমানসে মানসকন্যকা শিষ্যা
তুমি নিবেদিতা,
নিবেদিত দেহমন বিদেশ ভারতে,
এখানে নূতন জন্ম।
অনন্তবন্দিতা,
এখনও প্রহর ডাকে—
শোনো নিবেদিতা !

ভগিনী নিবেদিতা

[একটি Wyattian Sonnet]

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি মেয়ে শহরে প্লেগ দু'হাত দিয়ে রোখে
এসেছে দূর দেশের থেকে জননী তার 'আয়ার';
তুষার রং, সুনীল চোখ, মূর্তিখানি মায়ার
করছে সাফ্ রাস্তাঘাট বস্তিবাড়ি ও কে
মরলে কেউ অমনি ছোটে প্রবোধ দিতে শোকে,
দারুণ প্লেগে মরলো শিশু দরিদ্রের জায়ার
তারই পাশে দাঁড়িয়ে ওকে মতন হয়ে ছায়ার?
অই তো বোন নিবেদিতা চেনে গরীব লোকে।

একটি নারী বিদ্যালয়—ছোট্টো যার বহর,
একটি ছোটো স্ফুলিঙ্গই জাগিয়ে তোলে শহর।
মেয়েরা জাগে, বোনেরা জাগে, মায়েরা জাগে দেশে,
বাংলা এক করার ব্রত যুবারা নিলো শেষে।
বোসপাড়ার বৈঠকেই যুবারা আসে, শেখে
মোহিনী এক বিদেশিনীর স্বদেশী করা দেখে।

ভগ্নী নিবেদিতা

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

কোন্ সে অরণ্য-লক্ষ্মী বর্জিত উদ্যান ভালবেসে
ধান কাটা শেষ হলে কিছু ফুল একান্ত একাকী
ফুটিয়েছে, রিক্তপত্রগাছে কোন্ বাণবিদ্ধ পাখি
যন্ত্রণার স্বাদ ভুলে অমর সংগীত গায়, কে সে !

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মন্ত্রদীপ্ত কোন্ সে সেবিকা
আচ্ছন্ন দৃষ্টির কাছে ব্যাপ্ত করে আকাশের সীমা ?
নিরন্ন নিষ্পত্র রুগ্ন জীবনের কাছে অমর মহিমা
কে দেখালো, অন্ধকারে কে জ্বালালো আনন্দের শিখা ?

কার কাছে সারা বিশ্ব এক দেশ, একক সংহিতা,
এক বীণা-তারে বাঁধা সব প্রাণ, সব লোক দল ?
দুঃখের শ্যামল স্নেহ, বেদনার বিভূতি উজ্জ্বল
গায়ে মেখে মহীয়সী কোন্ নারী ? ভগ্নী নিবেদিতা !

সাত সাগরের আকাশ বেয়ে

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

বোনের সন্ধানে ভাইয়ের চোখের জল
এক শতাব্দী ও সাত সমুদ্র পেরিয়ে
দূর জন্মদিনের সোনালী ভোরে
যেন এইমাত্র শরতের আতপ্ত আমেজে
আয়ার্ল্যাণ্ডের কুটিরে পৌঁছুল।

আহা, আমার চোখের সামনে সদ্যফোটা
মুক্তার মতো অশ্রুকোমল স্বর্ণকেশীর
দিনে দিনে নীল নয়নের নিবিড় নীলিমায়
আকুল বিদেশিনীর সেবাবিষ্ট প্রাণে
দেবদূতীর শুভ্র পাখায় মার্গারেট
সাত সাগরের আকাশ বেয়ে জ্যোৎস্নায়
ভাগীরথীকূলে নামল!

আমি দেখেছি কুমারী গৌরীর
মনোলোকে ঠিকরে পড়ছে আলো,
বাংলার রক্তচন্দনের রঙিন ছোঁয়ায়
দিব্য স্বর্ণকমলের সূর্যমুখী সুষমায়
নিবেদিতারূপিণী করুণাময়ীর
আদিত্যহৃদয় প্রতিমা।

মা, তোমার রূপ ধরে না ভাষায়,
তুমি শিখাময়ী, শুধু বোন তো নও—
নয়নে নীলজবার অঞ্জলি,
হাতের অক্ষমালায় পরাধীন ভারতের নাম,
জপতে জপতে তুমি লোকমাতা,
এবং অমৃতা।

লোকমাতা নিবেদিতা

গোপাল ভৌমিক

একটি প্রাণের সীমাহীন ত্যাগ
এবং মনের মহিমা
ভূগোলের বাঁধন এড়িয়ে যে চলে
ছেড়ে সময়ের সীমা
বিশ্বাস করা কঠিন হলেও
অলীক কাহিনী নয় ঃ
নিবেদিতা এক নামের মন্ত্র
কি পরম বিস্ময় !

একশো বছর কম কথা নয়,
কঠিন নিজেকে চেনা ;
বদলে দিয়েছে পৃথিবীর রূপ
কালের কঠিন সেনা ।
বাউল হৃদয় তবু উপবাসী
হাতে নিয়ে একতারা
খুঁজে ফেরে সেই নারীহৃদয়ের
অসীম করুণাধারা ।

মহাকাশ আজ ধূলিধূসরিত
পরমাণবিক ঝড়ে,
ক্ষুধা আধিব্যাধি প্রপীড়িত সব
দেখি প্রতি ঘরে ঘরে ।
শিবজ্ঞানে জীবসেবা কে করবে,
কোথা সেই পরিত্রাতা ?
ভয় নেই, আছে বিবেকের বাণী
নিবেদিতা লোকমাতা ।

নিবেদিতা : শতাব্দী অর্ঘ্য

শান্তশীল দাশ

প্রতীচ্যের বুক হ'তে এলে তুমি প্রাচ্যভূমি 'পরে
গুরুর নির্দেশে ; গুরুভার নিলে তুলে সেবিকার :
অজ্ঞতায় সমাচ্ছন্ন, নানা গ্লানিভারে অবনত
এ ভূমি তোমারে বুকে তুলে নিল আনন্দে বিস্ময়ে।

ভারতভূমির সেবা—কী দুশ্চর সাধনা তোমার !
কত বাধা, কত বিঘ্ন ; সব সয়ে প্রসন্ন অন্তরে,
গুরু-আশীর্বাদ শিরে, নিয়োজিলে অক্লান্ত সেবায়
আপন জীবনখানি ; সে ব্রত কী দুঃসাধ্য সাধন !

আপনার সর্বসুখ বিসর্জন দিয়ে অকাতরে,
গুরুদত্ত সেবাব্রতে আত্মলীন দিবসে নিশীথে ;
তোমার সে তপস্বিনী মূর্তিখানি আজো কী উজ্জ্বল !
প্রাচ্যেরে আপন করে নিলে তুমি আত্মনিবেদনে।

লোকমাতা নিবেদিতা, সত্যই তুমি যে লোকমাতা ;
জননীর মত তুমি স্নেহ দিয়ে করেছ পালন,
এক হাতে গ্লানিভার দূর করে পরম নিষ্ঠায়,
অন্য হাতে জ্বেলে গেছ কল্যাণের শুভ্র দীপশিখা।

গুরু নিবেদন করে দিল যে অর্ঘ্যটি জননীরে,
সে-ভারতজননীর পদে তুমি সত্য নিবেদিতা ;
সার্থক ও নামখানি, সেবার কী অখণ্ড প্রতিমা !
শত দীপশিখা জ্বেলে পূজি আজ সেই প্রতিমায়।

নিবেদিতা

উমা দেবী

যদি বা পুষ্পের প্রাণ পাথরের কাঠিন্যকে পায়,
যদি বা পাথর গলে বয়ে যায় নির্ঝরে নির্ঝরে,
যদি বহ্নিশিখা তার খরতর জ্বালাকে হারায়—
অথচ জ্বালিয়ে রাখে আলো তার তারার প্রহরে,
সযত্নলালিত কোনো স্বপ্ন যদি নামে মর্ত্যস্তরে,
কোনো মর্ত্যরূপ যদি অমর্ত্যের ভাবমূর্তি পায়,
আত্মার নির্গুণ সত্তা যদি কোনো নারীরূপ ধরে
যদি বা সে নারী জ্বলে ওঠে কোনো প্রেমের শিখায়-
তখন হে নিবেদিতা, তোমার স্মৃতির সুধারসে,
জগৎ সিঞ্চিত হয়,—ভস্ম হয় অলোক আলোকে
তুচ্ছ কিংবা নগণ্য যা। পরাধীনতার গূঢ় শোকে
প্রেরণার শক্তিকেন্দ্র—মহিমার অনির্বাণ যশে,
তুমি কলা-অধিনেত্রী রূপময় শিল্পদৃষ্টিলোকে,
"নিবেদিতা" উচ্চারণে তারা পুষ্পবৃষ্টি এ ত্রিদশে।

নিবেদিতা ঃ শতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

দূরান্তর হতে এসে ভারত-আত্মার অন্তরালে
যে ঐতিহ্য গ্লানিহীন, যে সাধনা জ্যোতিতে ভাস্বর,
তাকে বুকে নিয়েছিলে সেবাপ্রাণ বাহুর আড়ালে,
গঙ্গা-যমুনার পথে যৌবনের শপথ-স্বাক্ষর !
ভারত তোমার কাছে সত্যের অটুট ধ্রুবতারা,
উচ্ছলিত আত্মত্যাগে নিরন্তর সেবা-উন্মুখতা ;
বঞ্চিতের পীড়িতের চোখে স্নিগ্ধ জ্যোতির ইশারা
তুমিই জাগিয়ে দিলে, চোখে চোখে নির্মেঘ মুগ্ধতা ।

বিদেশিনী পাখি যেন দুর্লভ মুক্তির প্রায়োজনে
প্রবীণ বটের মতো সমাহিত ঋষির কুটিরে
খুঁজে পেল মুক্তির উপায় । বিবেকের অন্বেষণে
জ্বললো সহিষ্ণু আলো বঞ্চনার মায়াবী শিবিরে ।
দ্বীপ থেকে দীপান্বিতা, নিবেদিত তাই নিবেদিতা,
কর্মে ধ্যানে আচরণে স্মরণীয় অনন্য শুচিতা ॥

নিবেদিতা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বরের বুকের মধ্যের ভালবাসা
সে-যে সাপের মাথার মণি ;
তুই কি পারবি তুলে আনতে বোন ?
কাছে গেলে তোর ভালবাসা রক্তে মাখামাখি হবে
বুকের মধ্যে ভয়ঙ্কর সাপের ছোবল বিষ ঢালবে, তোকে
দারুণ কষ্ট সহ্য করতে হবে।

তুই কি পারবি সব অসম্মান দু' হাতে সরিয়ে দিয়ে
ঈশ্বরের বুকের মধ্যে চলে যেতে ?

সন্ন্যাসিনী পৌঁছেছিল সে দুর্গম স্বর্গে, উপবাসী
নগ্ন পরাধীন ভারতবর্ষের কোটি সন্তানের
চোখের জলকে মন্ত্র ক'রে।

নিবেদিতা

জগন্নাথ চক্রবর্তী

বোন বলে কারে ডাকি ভাই বলে কে সবারে ডাকে,
কে ভগিনী আদরিণী সমর্পিতা ভারতের ধ্যানে ?
'মুক্ত হও, বীর হও' বীজমন্ত্র দেয় কানে কানে
হাতে হাতে বাঁধে রাখী, ভিক্ষুকের দীনতা কে ঢাকে ?

তপস্যায় বসে আছো তপস্বিনী কঠিন শিলায়
অন্ধকার ভারতবর্ষ প্রাণ চায়, আলো চায় প্রাণে ;
নির্বিবেক পীড়কেরা আজো মাতে মত্ত অভিযানে,
আত্মাহীন মাংসপেশী কুচকাওয়াজ করে এশিয়ায়।

উত্তরে ধবলগিরি দক্ষিণে প্রবাহী কুমারিকা—
তোমার স্নেহালু ছায়া ভারতের সব স্রোতে দোলে
তুমি যেন বসে আছো অদৃশ্য অজাতশিশু কোলে
যে-শিশু আত্মার বীর্যে রিপুঞ্জয়—নেবে জয়টীকা।

গঙ্গা গোদাবরী তীরে প্রাণ-সূর্য হবে নবোদিত
তরুণের স্বপ্ন তাই তোমার স্মৃতিতে নিবেদিত।

তুমি নিবেদিতা

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

তুলসীতলায় জ্বলে
সন্ধ্যাদীপশিখা,
তার সেই আত্মনিবেদন
পেয়েছিল তোমার মনন।

কালবৈশাখীর ঝড়ে
দীপ্ত বজ্রালোকে
মুহূর্তের জ্বলন্ত উল্লাস,
পেয়েছে সে তোমার প্রকাশ

স্তব্ধ শিব বক্ষ 'পরে
মৃত্যুরূপা শ্যামা,
জননীর পাদ-পীঠস্থান
তোমারি তো হৃদয় শ্মশান।

নিবেদিতা

সুশীলকুমার গুপ্ত

নিবেদিতা, নিবেদিতা। একটি নামের উচ্চারণে
একই অন্তরঙ্গ সুরে বজ্র আর ভোরের কাকলি
বেজে ওঠে, একই হিরণ্ময় শূন্যে করে গলাগলি
দুই বিপরীত সূর্য, কেল্টিক রক্তের আবর্তনে
যে আগুন জ্বলে তাতে কত মুক্ত পতঙ্গহৃদয়
পুড়ে পুড়ে গড়ে দেয় গৈরিক আকাশ, নীল ঝড়ে
অমর ভারত ডাকে দুর্জয় 'অচেনা কণ্ঠস্বরে,'
একই দেহে দুই জন্ম ঘটে নিয়ে চরম বিস্ময়।

নিবেদিতা, নিবেদিতা। 'লোকমাতা', মাটি ও আকাশ
মিলিয়েছ একই বৃন্তে, 'নীলাস'-এর দীপ্ত অনুভবে
মমতায় গলে গলে শতাব্দীর বিধ্বস্ত প্রান্তর
যে বসন্তে ফুটিয়েছ তারি ছন্দে চিন্ময় বিশ্বাস
ঢেউ তোলে আজও বুকে ; প্রাণময়ী বেদান্তিনী, কবে
তোমার ভারতী স্বপ্ন হবে মূর্ত নন্দিত সুন্দর !

অগ্নি, ভগ্নী, শস্য আমাদের

(নিবেদিতার প্রতি)

রাম বসু

[এক]

অদৃশ্য চাই না সন্ন্যাসিনী
চাই শান্ত জলকুণ্ড
যেখানে অদৃশ্য, দৃশ্য ঝুঁকে দেখে আপনার মুখ।

অমৃত চাই না সন্ন্যাসিনী
চাই সেই করপুট
যেখানে সমুদ্র-পাখি মেলে দেয় ডানার বিশাল।

চাই আমি জীবনের দিব্য বর্বরতা
অন্ধকার উৎস থেকে কণ্ঠ যার আকন্দ-আলোকে
যে আমার হাতে দেয় দূর্বা আর শাণিত মশাল।

দৃশ্যপট পিঙ্গল আকাশ
অগ্নি, ভগ্নী, শস্য
তৃষ্ণা ও নিবৃত্তি তাই সঙ্গত, সঙ্গীত।

হে বিদেশী ফুল
অথবা বিদেশী নও মানুষের পুষ্পিত স্বদেশে।

[দুই]

চাপকান পরা বিদ্বান বলেছিল : জাতটা ত প্রাচীন, তবে পাথর। চাপকান-পরা ঋষিরা পাথরটা পা দিয়ে নেড়ে বললে : না, মূর্তি কোঁদা যাবে না। আমি মিটমিট করে দেখলাম : ওদের চোখে চশমা।

আমাদের বুকের কাছে বিশ্ব লুকিয়েছিল শিশুর মতো।—
আমরা কাউকে বলি নি। সমুদ্রের দুঃসহ লবণে আমরা
অন্ধকারে জ্বলতাম। আর আক্রোশে ফেটে পড়বার জন্যে
আমরা আগুনের ভাষা খুঁজছিলাম। আমরা সেই সহোদরার
সন্ধানে ছিলাম যে ব্যাপ্ত হবে পতনে, উদ্ধারে!

তুমি বললে: স্মৃতি-মুখ এক দুর্গ। অগ্নির ভিতরে অধিষ্ঠিত
বাক্যে আমাদের উত্তরাধিকার। বল্লমের মুখে গাঁথা মুখ ত
সবচেয়ে সুন্দর। রাজমিস্ত্রি পরে ডাকা যাবে। আগে আগুনের
বাসর রচনা করো।

ধূলি ঝড়ের গৈরিক আকাশের নিচে, আহা, আমাদের সেই
পূতশুদ্ধ দিনগুলি! আহা সেই দিন যখন ঘৃণাগুলি
পাখির মতো গান গেয়েছিলো! আমরা অর্পিত হয়েছিলাম
পৃথিবীর, সময়ের বিদ্যুৎ-গ্রন্থিতে।

অগ্নি, শস্য, ভগ্নী আমাদের।

[তিন]

নিবেদিত গন্ধরাজি
আমি তাকে কি বলে ডাকবো?
কপালের আকীর্ণ গোলাপ
আমি তাকে কি বলে ডাকবো?

হৃদয়কে প্রসারিত হতে বলো
যেন সেই বাক্য শোনা যায়
অগ্নিকেন্দ্রে অধিষ্ঠান যার
যেন সেই মুক্তি পাওয়া যায়
শিখাতে স্বাক্ষর থাকে যার
অগ্নি ভগ্নী শস্য আমাদের।

নিবেদিতা

শান্তিকুমার ঘোষ

প্রকৃতি কি শক্তি ধরে···
নৌবহর টেনে আনে,
নিরাপদ রাখে কি বন্দরে ;
কিংবা ডুবো পাহাড়ে সহসা
আছড়িয়ে ভাঙে ?

···সব তুচ্ছ ক'রে
আলোকস্তম্ভের মত নারী
নিজের যৌবন থেকে
অগ্নি জ্বেলে নিয়ে
দাঁড়িয়ে দিশারী।

উন্মুক্ত পদ্মার তট
এই বুঝি সূর্যোদয়ে রাঙে—
কে আগে চলেছে গৌরী দীঘল গড়ন,
পিছে পিছে যত গ্রামজন ;
—জেগেছে সহস্র প্রাণ যেন মন্ত্রবলে !
কবি সঙ্গে চলে।

নিবেদিতা, ভগিনী আমার

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

"মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।"—রবীন্দ্রনাথ

সেই ত্যাগব্রত আজো দারুণ বিস্ময়…
নিরহঙ্কারের একে কে বলবে আত্মঅভিমান
তা নয় তা নয়—যার মনুষ্যত্ব জাগ্রত ভীষণ
যার মর্মে বেদনার নদী দিনরাত্রি বয়ে চলে
তারই মর্মে ভালবাসা প্রসন্ন প্রদীপ জ্বেলে রাখে,
লাঞ্ছিত মানব-আত্মা তারই কাছে ভ্রাতা ও ভগিনী,
গলির গোপনে থেকে চলে তার সেবার সাধনা
রাজপথ যদিও বা তার পদচিহ্ন ভিক্ষা করে…
কিন্তু কাকে নিবেদন করে গেছ সত্তা, নিবেদিতা,
মহীয়সী ভগিনী আমার,
তোমার ত্যাগের মূল্য কতটুকু দিয়েছি এখন
কারণ সবাই আমরা নিজ নিজ দামামা বাজাই
কারণ জীবন আজ সুবিধাবাদের সরঞ্জাম
এবং জীবন বলতে ত্যাগ কিংবা সত্যের আদর্শ
কোনো কিছু নেই—
অথচ তোমার মূর্তি ত্যাগের আদর্শে আজো জ্বলে,
নিষ্কাম কর্মের মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত করে তুমি
আমারই কি ভুলে-যাওয়া ভগিনীর মত হয়ে আছো,
তোমার মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে
দেরি হোক তবু যেন
আত্মজিজ্ঞাসার পথে করি মৌন আত্মআবিষ্কার।

কৈলাস পরিক্রমা

সুমণি মিত্র

বাগবাজারের উপান্তে ঐ দেখ চিৎপুর তার কর্কশ সংস্কার নিয়ে পড়ে আছে। ঘোড়ায়-টানা ট্রাম, বলদে-টানা গাড়ি, আর মানুষে-টানা ঠেলায় ঠোক্কর খেতে খেতে অমৃতপ্রবণ জীবের বিবর্ণ জীবনস্রোত পাক খেয়ে খেয়ে চলেছে।

দুপাশের গলিগুলোকে পগার বল্লে অপরাধ হয় না। আশপাশের বস্তি থেকে ছাই-পাঁশ, মাছের আঁশ, মরা ইঁদুর, নোংরা জল অবাধে নিবেদিত হচ্ছে। তার মধ্যে কোনটা ত্যাজ্য, কোনটা গ্রাহ্য, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করতে করতে নির্লোম নেড়িকুত্তার দল পরস্পরের মধ্যে খেয়োখেয়ি করছে। বস্তিবাসীদের বচসা তার চেয়ে শ্রুতিরমণীয় নয়।

গলির মোড়ে, ফুটপাতের এককোণে, পানউলির ঐ ছোট্ট দোকানটা রুক্ষ চিৎপুরের বুকে মরূদ্যানবিশেষ। পরিশ্রান্ত পথিকের দল পান-খাওয়ার ফিকিরে চঞ্চলবিলোচনা কৌতুকিনীর কুটিলায়িত অধরের মদিরায়িত একটু হাসির জন্যে প্রতীক্ষাকুলচিত্তে বসে আছে।

বড় রাস্তায় বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। চবিশ্বুবাসিত জলের বন্যা বইয়ে খোপকাটা ফুটপাতের বুকে নির্বিবাদে চামড়া আছড়াচ্ছে চামার, দুর্গন্ধে পেট ঘুলিয়ে উঠছে। ঘোড়ার নাদ, গোবর, বিষ্ঠা—কি নেই? মরা কুকুর, মরা গোরু—কিছুরই অভাব নেই! একপাল লুব্ধ শকুনি ফুটপাতের ঐ ন্যাড়া গাছটাকে আচ্ছন্ন করে কদাকার গলা দুলিয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে! তারই পাশে নির্বিকারচিত্তে ফলওলা কাটাফল বেচছে—পেঁপে, তরমুজ, শশা! আইসক্রীমওলা আইসক্রীম বিক্রি করছে অম্লানবদনে!

রাস্তার দুধারে পায়রার খোপের মত সারি সারি সব দোকান। জুতোপট্টিতে জরিদার নাগরা ঝুলছে হেলেদুলে, রোদ্দুরে থেকে থেকে ঝিকমিকিয়ে উঠছে।

তামাকপট্টিতে তামাকের তাল। দেখতে কদর্য হলেও তৈরি তামাকের মদো মিষ্টি গন্ধ মনে কেমন যেন মৌতাত ধরিয়ে দেয়।

ও-ফুটে বাসনপট্টি। ঝকঝকে পিতল-কাঁসার বাসন প্রসাধিত রূপের জেল্লায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

তার ওপাশে লেস, শাড়ী ও ব্লাউসের পাড়া। চটকদার শাড়ির বিচিত্র বর্ণচ্ছটা পথিকের নির্বাসিত বাসনাকে তৃষ্ণায়িত করে তোলে।

কেবল লোহাপট্টির মুখে হাসি নেই। খুন্তি, হাতা, বেড়ি, কড়া, চিমটে, চাটু, হামানদিস্তে—সব সদলবলে গোমড়ামুখে বসে আছে।

ঐ যে মসজিদটা দেখা যাচ্ছে, ওর পর থেকেই মুসলমানদের পোশাকপট্টি। বুটিদার পাঞ্জাবি, মখমলি ফেজ ও গুলদার কামিজে গুলজার।

এখান থেকেই সুর্তি ও জর্দার খুসবু হাত ধরে জর্দাপট্টিতে টেনে নিয়ে যায়।

এইবার মিঠাইওয়ালাদের এলাকা। গ্লাসকেসের অদৃশ্য আড়াল থেকে সুবিন্যস্ত বর্ণায়িত মিষ্টান্ন পথিকের তৃতীয় রিপুকে তোলপাড় করছে।

ওদিকে ফুলপট্টি বর্ণাঢ্য শোভায় আলিম্পিত হয়ে পথচারীকে প্রণয়োচ্ছল আহ্বান জানাচ্ছে।

ঐ জড়িবুটিওলা বেদের খুপরির পাশেই গাঁজা আর আফিমের আড়ৎ। বেদের ঝুড়িতে বিচিত্র সম্ভার—হাড়, গাঁটওলা লাঠি, শুকনো শিকড়, গাছের ছাল, গিরগিটি, ব্যাঙ, গোখরো সাপ ও কুমিরের চামড়া—কি নেই?

আর ঐ কি শেষ? আরও কত কি যে আছে চিৎপুরে খড়মপট্টি,

মাদুরপট্টি, পাথরপট্টি—বলে শেষ করা যায় না। তাও তো ফেরিওলাদের ফর্দ বাদ দিলাম।

ওরই ফাঁকে ফাঁকে খোলার চালের যে-বস্তিগুলো দেখা যায়, সেখানে চলেছে অবিধিপ্রগল্‌ভ জীবনযাত্রা—অনাচার ও স্বেচ্ছাচারে ক্লিন্ন। ইচ্ছাবিলাসের অবরোধ ভেঙে গৃহধর্ম সেখানে প্রবেশ করতে পারে না।

আমি কতদিন দেখেছি তোমার পায়ে একজোড়া চটি গলিয়ে বোসপাড়ার গলি থেকে বেরিয়ে বাগবাজারের সীমানা ছাড়িয়ে চিৎপুরের এই বিচিত্র সড়কে স্কুলের মেয়েদের মত হিল্লোলিত হয়ে টহল দিচ্ছ। চোখে মমতামথিত দৃষ্টি, শ্রদ্ধার সাত্ত্বিক আবেগে বাষ্পায়িত। আবার চিৎপুরের সমালোচকদের প্রতি সেই তরলিত দৃষ্টিকে বহ্নিময় হয়ে উঠতেও দেখেছি কতবার। কিছু বুঝতে পারতাম না।

সন্ধ্যার পর থেকে চিৎপুরের আর এক চেহারা। নূপুরিতা নর্তকীর নৃত্যায়িত দেহের ঊর্মিল প্রগল্‌ভতায়, সুধাকণ্ঠী লাস্যময়ীর উদাত্ত স্বরলহরীর মদাবেশবিহ্বলতায়, মদিরাক্ষী রঙ্গিণীর নেত্রভঙ্গী ও ভ্রূভঙ্গিমায় মদিরায়িত। সে তখন উল্লাসলিপ্সু মানুষের কামনার উপবন, পিপাসিতচিত্তের গুঞ্জন গুলজার।

বৃহৎ আনন্দের বৈচিত্র্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যারা তুচ্ছ বাসনার অলাতচক্রে অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে চায়, জান্তব জীবনের অভিশাপে যারা উন্মত্ত এবং শ্রীহীন, ক্ষণপ্রণয়ের নিঃশ্রীক উল্লাসে যারা বিচঞ্চল, তাদের বক্ষোনিভৃতের কামনাবিহ্বল নিঃশ্বাসকে ঝঞ্ঝায়িত করে প্রণয়োৎসবে ডাক দেয় ছলনানিপুণা পণ্যা, লুব্ধ লুণ্ঠকিনীর মত হরণ করে নেয় তাদের সত্তা।

এইসব ক্ষণপ্রণয়িনীদের কুটিল সঙ্কল্প যেন রসাতলবাসী সরীসৃপের মত সমাজজীবনের অঙ্গীকারকে নিঃশব্দে ডিঙিয়ে প্রাত্যহিক বিধিনিষেধে ঘেরা কতকগুলো মুহূর্ত গ্রাস করে এনে নিঃসাড়ে সৃষ্টি করেছে এই অনাচার কলুষিত রাত্রি।

অথচ তুমি কিনা কলকাতার এই ক্লেদাক্ত পল্লীর কাছে আত্ম-নিবেদন করলে—আশ্চর্য।

শুনেছি শিবভক্ত তুমি লিখেছ—'পার্থিব পঙ্কিলতার বহু ঊর্ধ্বে চির নিস্তব্ধ ও চিরতুষারাবৃত কৈলাসপর্বতে থাকেন শিব—আমাদের শিবলিঙ্গ যাঁর প্রতীক। অথচ এখানে সে কৈলাসের বিশুদ্ধতা কিংবা নিস্তব্ধতা কৈ? এখানে নৃত্যগীত, ভ্রূভঙ্গী, রক্ত-মাংসের প্রাধান্য, রূপ-রসের হৈ-চৈ!

তুমি আরও লিখেছ—'কৈলাসপতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক হচ্ছেন হিমাবৃত গিরিগুহায় আত্মধ্যানে লীন স্পৃহাহীন সন্ন্যাসিকুল'—যাঁরা শুদ্ধাচারী সংযতেন্দ্রিয় এবং অবিচলিতচিত্ত; রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে পা পিছলে আমাদের মত যাঁরা হাত-পা ভাঙেন না, যাঁদের শুচিতানিষ্ঠ জীবন কঠোর কৃচ্ছ্রতায় ক্লিষ্ট।

অথচ এখানে যারা থাকে তাদের দেহ, মন, চিন্তা বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের আলোয় ভাস্বরিত নয়। এরা বিষয়াবৃত, অজিতেন্দ্রিয়, গৃহাসক্তচিত্ত। এরা দুর্নীত, দুর্বিনীত এবং জড়ীভূত।

তুচ্ছ ও ক্ষণিকের তৃষ্ণায় এরা উদ্দাম, আত্মপরপ্রভেদবুদ্ধিতে এরা অটল। এরা উৎকট আকাঙ্ক্ষাচারী। এদের স্বার্থবোধ আত্মসুখের বিষয়কে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে কৈলাস পর্বতকেও ছাড়িয়ে গেছে।

তবুও এদের জন্য কি না-করেছ? এদের অধঃপতিত জীবনযাত্রা দেখে বিচলিত হয়ে স্বদেশপ্রেমিক বা প্রেমিক বিদেশীর মত সুউচ্চ মঞ্চ থেকে করুণা কিংবা অনুগ্রহ করনি, তুমি এদের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছ। ফুল বেলপাতা গঙ্গাজল দিয়ে পুজোটাই শুধু করনি।

কম্বল দিয়ে শীতার্তকে পুজো করেছ, বিবস্ত্রকে পুজো করেছ বস্ত্র দিয়ে, অন্ন দিয়ে ক্ষুধার্তকে পুজো করেছ, শোকার্তকে পুজো করছে মর্মবেদনা দিয়ে। এমন কি প্রবঞ্চককেও পুজো করেছ অর্থ দিয়ে—করনি?

কৈ আমরা ত পারি না। আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলে উপাধির সঙ্গে নিজেদের আধ্যাত্মিক তাদাত্ম্য সৃষ্টি করে আত্মার মহিমায় আস্থা

হারিয়েছি, তাই পারি না। আমাদের এই আত্মিক অন্ধতাই অশিবের মধ্যে শিবকে দেখতে দেয় না। নামরূপের স্বল্পসীমায় ফেলে আমরা আমাদের অনন্তকে প্রতিনিয়ত খর্বই করি।

যে চৈতন্য দিয়ে আমরা চিৎপুরকে চিন্তা করি, দেখি, জানি, কিংবা বুঝি—সেটা একটা মিশ্রজ্ঞান, বিশুদ্ধ চৈতন্য নয়; চৈতন্যের সঙ্গে নামরূপের ভেজাল দিয়ে তৈরী বিভ্রান্তিকর সোপাধিক বোধ—যার পারমার্থিক কোন নিত্যতা নেই। নামরূপ নিষ্প্রভ নাহলে সত্যের সুপ্রভাত হয় না।

গুরুকৃপায় তুমি নামরূপের এই লৌহজাল ছিন্ন করতে পেরেছিলে বলেই বিবেকানন্দের বহুবাঞ্ছিত 'ব্যবহারিক বেদান্ত' তোমার কর্মময় জীবনে এমন চৈতন্যময় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

তাই তুমি চিৎপুরকে ত্যাগ করনি, তার নামরূপের খোসাটা ত্যাগ করেছিলে। বাগবাজারকে বর্জন করোনি, তার উপরকার উপাধির আবর্জনাটাকে বর্জন করেছিলে। ফলে অনিত্য নামরূপের অন্তরালে শাশ্বত যে শিব-সত্তা জ্বলজ্বল করছেন, তুমি তাঁকেই দেখেছিলে।

তাই তোমার আত্মনিবেদন এত স্বাভাবিক, এমন অনিবার্য। তোমার আন্তরিকতা এমন সাবলীল, এমন নিশ্ছিদ্র। তোমার ইচ্ছাশক্তি এমন দুর্ধর্ষ এবং সর্বজয়ী। তোমার জীবন এমন আনন্দোচ্ছল এবং প্রাতিভজ্যোতিতে প্রোজ্জ্বল।

কতদিন দেখেছি তোমায় চিৎপুরের রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে—সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়। তখন ভাবতাম ভ্রমণবিলাস। এখন বুঝেছি—ওটা তোমার কৈলাস পরিক্রমা।

একটি স্বপ্ন

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ভগিনী নিবেদিতার মতো সূর্য ওঠে আজো
আরক্ত গেরুয়া,
কে যেন বলে, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?'
অমনি খোলে দুয়ার :
দেখতে পাই পাহাড় বেয়ে পরিব্রাজক নামে,
হৃদয় থেকে গ্রামে,
এবং শেষে নগরে যায়, নগর থেকে শেষে
মন্ত্রবীজ মঞ্জরিত সকল দেশে-দেশে ;
দেখতে পাবে সে-মঞ্জরী তোমার মর্মে তুলে
ভগিনী নিবেদিতার মতো সূর্য প্রাচীমূলে ॥

লোকমাতা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদিতা ছিলেন লোকমাতা।...যে মাতৃভাব পরিবারের বাইরে একটি সমগ্র দেশের উপর আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই।—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে মনে ইচ্ছা হয় যাচি তুমি আবার মোহানুবদ্ধ হয়ে ফিরে এসো—
সাত সিন্ধু পার হয়ে ভীষণ মলিন বৃষ্টি-ঝেঁপে-আসা গলির চত্বরে—
মাড়ানো হলুদ ঘাস ইঁট-ওঠা সড়ক পুণ্যরজে
ভরে দিয়ে—মনে মনে যাচ্ঞা করি।

তুমি ঐ মলিন সড়ক ধরে আমাদের নগরোপান্তের জেতবনে
বিহারদেহলী অতিক্রম করে এসেছিলে একদিন, তারপর
চারিদিকে তৃষ্ণার তৃষ্ণার লক্ষ উদ্বাহু মশাল ক্লান্ত চীৎকার ফুঁপিয়ে
বেজে উঠে
সব আলো জীর্ণ করে যাওয়ার মুহূর্তে তুমি সেই
সকল সদ্ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে নিঃশেষে, অভীষ্ট
ভবনিরোধের ব্রত দূর শমীগাছের শিখরে সঙ্গোপনে
চুপি চুপি রেখে এসে ভীষণ জ্যোৎস্নার তুল্য চীবর শরীরে তুলে নিয়ে
একা শুধু একা শুধু বরাভয়মাত্র হাতে ঢুকেছিলে আর্ত জনপদে।

যা কিছু সুবর্ণনিধি সব সঞ্চয়জ্ঞ ইতিহাস
যক্ষের মতন তুলে রাখে।
যেন তাতে আর কারো দাবি নেই যেন সব যাচ্ঞার দিগন্ত খুব কাছা-
কাছি মুখের উপরে
'না'-বলে এগিয়ে থাকে নিশিদিন।

তবু মনে মনে এই মুহূর্তে আবার
শহরতলির তীক্ষ্ণ ভাঁটবন ডিঙিয়ে তার কুশাগ্রে চরণ শোণিতাক্ত করে
আমার দুয়ারে
উঠে আসো, অন্তত আরেকবার উঠে আসো—
সেই রক্তলেখা দিয়ে জীবন বিন্যাস করে যাও—
কেননা যে মৃত্যু তুমি জানোনি তারো অধিক নিয়তি আমার
বুকে বাসা বেঁধে আছে,
আমার ঘরের চালে উন্থত খড়েগর মতো মেঘ
নেমে আছে, আমার শিয়রে এক অরূপা ভয়ের মতো আত্মহননের
রাত্রিবেলা
জেগে আছে,
কেননা আমার কোনো মৃত্যুর খবর কারো কাছে
পৌঁছয়নি, আমার নিভৃততম অসহায়তম মৃত্যুগুলি
শরণ নেবার মতো কারোকে না পেয়ে মরে আছে।
তার পাশে ঐ গোটা শহরের সাজানো বাগানভরা মরশুমি
ফুলের সুভাষিত
পথের দু-ধারি যত রাঙ্‌তায় বানানো হিতকথা
নরম আঁচের মতো জ্বলে যায়।

যদি তুমি পুরোনো মায়ের সাজে রেড়ির দীপটি হাতে নিয়ে
অফুরান সন্ধ্যাবেলা আমার ঘরের মধ্যে উঠে আসো, যদি
তোমার আঁচলে বাঁধা সোনা ছুঁইয়ে দাও, যদি সেই মহামায়া—
গোটা জনপদজোড়া মহীরূহোপম কামনার
তেজঃপুঞ্জ তিল তিল করে সমাহৃত হয়ে অপ্রতিহত যে মহাশক্তি মূর্ত
করে তোলে সেই
মহামায়া স্বয়ং তোমার
হৃদয়ে বাহুতে জেগে ওঠেন আবার,—যদি দীর্ঘ পথ সব ইতিহাস

ঘুরিয়ে পেরিয়ে এই ভীষণ মলিন বৃষ্টি-ঝেঁপে-আসা গলির চত্বরে
শুধু বরাভয়মাত্র হাতে ফিরে আসো—
এইসব ভয়ানক 'যদি'-র নির্বন্ধে মনে মনে
তোমার চোখের করুণাশ্রু সূর্যকিরণের মতো জ্বলে ওঠে!

মনে মনে ইচ্ছা হয় যাচি তুমি আবার মোহানুবদ্ধ হয়ে ফিরে এসো
অয়ি লোকমাতা নিবেদিতা।

নিবেদিতা পারাবারে

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

সাগরে তরঙ্গ আর নদীকূলে গতির নিশানা,
চিন্ময়, ঈশ্বরের প্রসারিত সীমাহীন সময়ের ডানা
বেয়ে বেয়ে পৃথিবীর পথ চলে। আমি, তুমি. অন্য সব মিলে
কোটি কোটি বছরের পায়ে হাঁটা ভারত-মঞ্জিলে
পাঠান, মোগল, চীন, ইংরেজ—এক সূত্রে গাঁথা ইতিহাসে
শোণিতের পাশাপাশি ক্ষমা ঢেলে পথ গেছি করে
প্রগতির। যুগে যুগে এ' পথে যে আলো নিয়ে আসে,
পাথরের ভাঁজ আর মানুষের বুক থেকে ভয় খুঁটে 'মাভৈ' বাণীতে
চলার পাথেয় দেয়, সে' বিবেক ° আমাদেরই তরে
নির্ভীক, ক্লেদ ঘেঁটে সত্যকে সাবলীল বুকে তুলে নিতে
সে কখনো করেনিক দ্বিধা। তার ডাকে কেঁপেছে বসুধা।
সে দিয়েছে উপহার, নিবেদিতা : পারাবার-উপচানো সুধা।

নিবেদিতা, আমি সেই পারাবার পাশে এক গতিহীন শামুকের মন,
কণামাত্র সুধা পেয়ে তৃপ্তির হাসিমুখ দেখি। দেবী তুমি, দূরে
মানুষের ঘরে ঘরে নিয়ে গেছ ভালোবাসা, সাত রাজা ধন।
পদক্ষেপে দৃঢ় এক ছন্দোময় আশার নূপুরে
চেতনার দ্বার খোলে, দেখি পাশে খোলস ছাড়িয়ে
সূর্য, এবং সারা পৃথিবীর নরনারী এক
জীবনের ডালি হাতে এক সাথে রয়েছে দাঁড়িয়ে—
নিবেদিতা-পারাবারে শান্তির, ঐক্যের হবে অভিষেক।

নিবেদিতার ছবি : দেশান্তর

শিবশম্ভু পাল

স্পর্শের চেয়েও বেশি ঢের বেশি স্পর্শ পাই তোমার ছবিতে
স্নেহের উত্তাপ যেন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যায় ভুলে যাই আত্মপরিচয়
বিনিময়ে পেয়ে যাই সুস্নাত আমাকে নবতর
যেন এক অন্ধকারসমাচ্ছন্ন অথচ সমৃদ্ধ কোনো সুজলা সুফলা
দেশ খুঁজে পাওয়া আর সেদেশের নরম মাটিতে
বিজয় পতাকা পুঁতে সুখে উপনিবেশ নির্মাণ।

তোমার আলেখ্য করে দেশান্তরী। আমি আর তখন আমাকে
ধরতে পারি না ছুটে, কাঁধে হাত চেপে ধরে তাকে
গুরুদশাগ্রস্ত ঘরে টেনে আনতে ব্যর্থ হই। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে
শুধুমাত্র দেখে যাই আপনাকে মন্দিরের চূড়ার ধ্বজায়
কি সুন্দর সামুদ্রিক বাতাসের স্নেহ হয়ে গেছি।

তুমি সে বাতাস, পুণ্য দেশান্তর, নবতর উপনিবেশের
আমন্ত্রণ ; আমি সেই স্পর্শ পাই ভুলে যাই আত্মপরিচয়
তোমার আলেখ্য বেয়ে চলে যাই কখনো কখনো
অচেনা ভারতবর্ষে, মৃত্তিকার অন্ধকারে, দূরান্ত আকাশে
আবিষ্কারে লিপ্ত হই তোমারই দাক্ষিণ্যে, নিবেদিতা।

দুটি সত্তায় একটি মানবী

নচিকেতা ভরদ্বাজ

কোনো কোনো মানুষের মানুষীর বুকের ভিতরে
দুটি সূর্য বসবাস করে :
এক সূর্য জীবনের ভালোবাসা হয়ে
আলো দেয়, স্বপ্ন আনে, বৃষ্টি হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে :
রৌদ্র বৃষ্টি ছায়া দিয়ে—সুন্দর বিস্ময়ে
আলবাল রচনা করে, অবিরাম মায়ের প্রার্থনা।
এক সূর্য প্রত্যহে ডুবে এনে দেয় সম্পন্ন ভোরের আকাশ
পৃথিবীতে, এক সূর্য সমুদ্র হয়ে নদীর জ্যোৎস্নায়
জল দেয়—, সে সূর্যের হাতে সব সৃষ্টির রচনা
শেষহীন হতে থাকে, সে সূর্য মেঘের টানে, হাওয়ায় হাওয়ায়
প্রাণের বহতা আনে, জীবনের বরবোধিমূলে
যে সূর্য জ্বালায় দীপ, মা-টি হয়ে মাটির গভীরে
জেগে থাকে রাত্রিদিন। সমস্ত ক্ষতের দাগ, ফুলে—
সবুজ নশ্বর ঘাসে ঢেকে রাখে—স্নেহের শরীরে।
আর এক সূর্য থাকে পাশাপাশি—তীব্র তার আতপ্তদাহন
দুঃসহ রৌদ্ররাগে ক্ষমাহীন উদ্যত ভয়াল,
রুদ্রাণীর মতো দীপ্র, অপরাধ অন্যায়কে পদপিষ্ট করে
মহীয়সী। যেখানে ভীরুতা, গ্লানি, অপরাধ পাপের পতন
পাতাল মেলেছে জিহ্বা—সেখানে সে প্রলয় মাতাল।
প্রতিবাদী ইচ্ছা তার পূর্ণতার জয়ধ্বনি করে
মানুষের গান গায়। বিদ্যুৎবিকীর্ণ ঝড়ে আকাশকে অপাবৃত করে।
বিপরীত এই দুটি সূর্যের সুন্দর সান্বয়—

আমরা তোমার মধ্যে, হে জননী, তোমার আকাশে
একদিন দেখেছি : এক বুকে ভালোবাসা, স্নেহনম্র ভয়,
নিত্য নিবেদিতা মাতা আমাদের আরোগ্য শিয়রে।
অন্যদিকে আমাদের দীনতায়, পরাজিত অন্ধকারে আগ্নেয় উল্লাসে
নির্মম কঠিন তুমি,—ভর্ৎসনায় শাসনে ধিক্কারে।
তোমার প্রথম সূর্যে স্নান করে বহু আলো, অনেক উত্তাপ
আমরা নিয়েছি রক্তে ; এবারে দক্ষিণ মুখে আমাদের অতল আঁধারে
ফিরে এসো ; দ্বিতীয় সত্তায় জ্বলো, দাও অভিশাপ।
তোমার ভারতবর্ষে দ্বিতীয় সূর্যের
আজ বড়ো প্রয়োজন—উন্মীলিত অগ্নিবীর্যে সমন্বয়ের
শান্তি-পথ। সেই পথই মনুষ্যত্ববোধের প্রাঙ্গণে
শেষ হবে : সব শুদ্ধ হবে শুদ্ধির দহনে।
অক্ষয়বটের তলে আপাতত প্রিয়-প্রণয়ের
মুগ্ধ দিন শেষ হোক। আগ্নেয় উৎসবে
সমস্ত জ্বলে যাক—, দুই সূর্যে তারপর সমন্বয় হবে।
শতবর্ষে দীক্ষা দাও আজ সেই জীবনজয়ের
ক্লেশকর পরিচর্যা—মহা অভিজ্ঞান দাও
—হাতে হাতে ভীষণ নীরবে।

নিবেদিতা

মানস রায় চৌধুরী

ছবি নেই কোনো ছবি নেই বুকে
তোমার মূর্তি অধুনা
আমার স্মৃতির ভিতরে সুদূর, সুপ্ত
অথচ ভিতরে অনন্ত স্রোত প্রবাহিত
ছুঁয়ে দেখি
সেখানে তোমার গোড়ালির তাপ
পা ডুবিয়ে বসে আছো।

আমার ভিতরে যেটুকু শুভ্র যে-টুকু গঙ্গোদক
সেইখানে আছে নিবেদিত ছায়াঘন
ত্যাগের বিশাল বটবৃক্ষের ডালপালাগুলি যেন
চিরকাল রাখে প্রশান্তি ভিতরের
ছবি নেই কোনো ছবি নেই ঘরে
কল্পনা জুড়ে প্রসারিত আঁখি প্রসন্ন আশ্বাসে
চিরকল্যাণী আমার রক্তে জাগাও ভারতবর্ষ।

অদীক্ষিত

শক্তিব্রত ঘোষ

ক্ষমার রুদ্রাক্ষ হাতে কেউ হেঁটে গেলে
নিকোটিনে দগ্ধ হাত কেঁপে ওঠে।

আমি ভীষণ হিংসা চাই ; বাঁকা স্রোত
শোণিতের ; নিষ্ঠুরতাগুলি
হৃদয়ে লালন করি ; বাগানে ফুলের মুখে
অসতীর চিহ্ন চাই ; ঘরে অন্ধকার জেলে
সততার নামাবলী পোড়াই উৎসবে।

আলোর রুদ্রাক্ষ হাতে কেউ হেঁটে গেলে
অহঙ্কারে দগ্ধ বুক কেঁপে ওঠে।

নিবেদিতা

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

বুকের মানুষটাকে—যে আছে ঘুমিয়ে
তাকে তুলে আনতে হবে ;
বলেছিলে : উঠে এসো, জাগো,
মুক্তি চাই অন্ধকার থেকে
অস্তিত্বের মুক্তি—মানুষের—
মুক্তি তো সেখানে ;

বলেছিলে : উঠে এসো, ভালোবাসো মানুষ মানুষে,
আর্তের সেবায় এসো, ত্রাণে, শুশ্রূষায়,
বুকের মানুষটাকে পাবে সেইখানে।

মাটির অনেক উর্ধ্বে চিরকাল
মানুষের বিরাট উজ্জ্বল উপস্থিতি—
সেই মানুষেরে অন্ধ রেখে
কার মাটি—কার ঘর—কার দেশাচার—
কার জয় পরাজয়—কে করে বিচার।

তুমি দিয়েছিলে, ওই অন্ধকার ছিঁড়ে
বুকের মানুষটাকে—যে ছিল ঘুমিয়ে
তাকে
মুক্তি দিয়েছিলে।

নিবেদিতাকে স্মরণ করে

পবিত্র সরকার

মন্দিরে ঈশ্বর থাকেন, তবু আর মন্দিরে যাওয়া সম্ভব নয়।
ঈশ্বর এখন খুব অর্ধপরিচিত ;
আলাপ ঝালিয়ে নেবার উৎসাহও নেই।
চাঁদার রসিদপত্রে তলব পৌঁছুলে
মাঝে মাঝে তাঁকে নজরানা অবশ্য দিতেই হয়।
আমি কিছু ব্যক্তিগত দুঃখসুখ নিয়ে চমৎকার আছি।
ঈশ্বরকে সেখানে নিমন্ত্রণ না-করাই ভালো।
তাঁর সঙ্গে আমার কোনো সামাজিকতার দায় আর নেই।
তাঁর চিরকুট এলে আমি একদিন যেন
'কে এই ঈশ্বর ?' বলে ভ্রূ কুঁচকে তাকাতে পারি—
এ আমার আকৈশোর সাধ।
মন্দিরে যাই না, কিন্তু মানুষকে কখনও কখনও
প্রণাম নিবেদনের ইচ্ছা হয়।
সেই সব মানুষকে, যাঁরা মানুষকেই শরণ্য ভেবে
নিজেদের সমস্ত জীবনকে একটি গভীর ব্যাকুল বিনত
প্রণামের আদলে
নির্মাণ করেছেন,
যাঁরা কর্মে, সংগ্রামে কিংবা আত্মনিবেদনে
আমার ঈশ্বরের দিক থেকে ফিরিয়ে নেওয়া সম্মানকে
মানুষের দিকে পৌঁছে দিয়েছেন।
আমি ঈশ্বরকে সহজে প্রণাম করতে পারি না
কিন্তু একটি সুন্দর প্রণামকে প্রণাম করতে আমার
দ্বিধা হয় না।

লোকমাতা

অধীর সরকার

ওই দ্যাখো স্মিত সূর্য প্রসন্ন উজ্জ্বল
দিগন্ত রাঙানো দ্যুতি বিশ্বময় ;
ওই দ্যাখো দীপ্ত সূর্য স্বমহিমান্বিত
নত করো আপন হৃদয়।

বিদূরিত অন্ধকার। মনের গভীরে যত প্রশ্ন-সংশয়
যত তর্ক, মিথ্যা অবিশ্বাস
অবসিত হ'ল। চিত্ত দ্বিধাহীন। আর ভয় নেই—
দূরে ঊর্ধ্বে শান্ত নীলাকাশ।

গভীর বিশ্বাসে তাই জীবনের কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নির্ভয়
তুমি সে বিস্ময়,
আপনার পরিচয় মানুষের নানাবিধ হিতে
রেখে গেছ একান্ত নিভৃতে।
পরাধীন ভারতের অন্তরেতে সুবিপুল গ্লানি—
গভীর বেদনাবোধে মগ্ন হ'ল চিত্তবীণাখানি
ভিজে গেল মন ;
সেবায়, সান্নিধ্যে, ত্যাগে
এ জাতির মর্মমূলে করে নিলে আপন আসন।

শুচিশুভ্র। স্নিগ্ধকান্তি। বিশাল হৃদয়
ওগো বিদেশিনী,

কোন্ ক্ষণে শুনেছিলে রুদ্ধবাক্ আত্মার ক্রন্দন
সমুদ্রের পার হ'তে ;   তোমাকেই চিনি
আত্মার আত্মীয়রূপে।   শতবর্ষ পরে তাই
জাতির মানসপটে অমলিন পুণ্য জয়গাথা ;
দেবতার নিবেদিত ;   নিয়োজিত মানবকল্যাণে-
তুমি লোকমাতা।

নিবেদিতা

সামসুল হক

অপেক্ষমান গন্ধব্যাকুল যে-দীপাধার
নিরুপদ্রব শীতল থাকা অসহ্য তার,
শব্দ ছেড়ে ধ্বনি ছেড়ে পদধ্বনি
অন্য কারো
শুনবে ব'লে ব্যাকুল থাকে, শুদ্ধতার ও
আয়ু যাপন করার মধ্যে শীতলতার
স্থান না থাকায় ঘোর অপেক্ষমান সে দীপাধার
জ্বলবে ব'লে
আসর্বস্ব সমর্পিত বিভার কোলে।

স্থিতির প্রতীক কোথায় থাকে, প্রজ্ঞালোকে ?
জীবন জানে সেখানে নয়, হঠাৎ চোখে
নিজের ছায়া—প্রজ্ঞা ভাঙে জলের ধারে,
যে-আধারে
সাগর ছিলো, আসর্বস্ব নিবেদিত
হ'য়ে সেথায় হ'য়ে রইলে জীবনবৃত্ত !

নিবেদিতার জন্য

আশিস সান্যাল

কোনওখানে দীপ্তি নেই মানুষের চেয়ে। 'আমিই ঈশ্বর'···
এই স্পষ্ট ভাবনার উদ্বেলিত সাগর-সঙ্গমে
তুমি কোন দৈবতের উচ্চারণ শোনায়েছো সার্থক আভাসে?
এ কোন প্রস্ফুট প্রীতি? যার নামে জগৎ সংসার
একাকার হয়ে যায়? যার নামে একদিন স্বদেশ বিদেশ
একই মৌল আনন্দের সফেদ আড়ালে হয় শাশ্বত ধরণী?

বাসনার চেয়ে কোনও শুভ্রতম প্রতিবাদ নেই। সর্বত্র বেদনা
বাসনা বিক্ষত রক্তে জন্ম নেয়। হৃদয়েতে যার
বাসনার ধ্বনি নেই···সে যেন রে গতিহীন নিস্তব্ধ বিবরে
স্বাভাবিক নিমজ্জিত। তোমার চোখের জলে অথচ নির্ভয়
শুনেছি ধ্বনিত সব বাসনার স্পন্দিত নির্জন। আনন্দ তোমার
দুঃখের ভিতরে স্থির উদ্ভাসিত। তোমার মহিমা
জেনেছি নির্ভীক সব মানুষের নির্ধারিত চৈতন্যের সার্থক বেদনা॥

নিবেদিতা

বিনোদ বেরা

এখন হৃদয়গুলি বড়ো বেশি ব্যস্ততায় ভরা
এখন হৃদয়গুলি সূর্যকরোজ্জ্বল
মমতা প্রীতির সেবা দয়া হিতৈষণার উদ্বেল
প্রেরণা তেমন আর পায় না, আমরা
ক্রমশই বড়ো বেশি ব্যক্তিগত সংকীর্ণ মানুষে
পরিণত হচ্ছি, নিবেদিতা !

প্রত্যেক সবল বুক আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের
মেধা ও মনীষা আত্মপ্রকাশের যৌথ উদ্যম
অনুভব করে যবে চেয়েছিলো পৃথিবীর অমর সখ্যতা—
সেইকালে, রামমোহন রবীন্দ্র ও বিবেকানন্দের
পৌরুষ বালার্কে গড়া বিশাল ভুবনে
তুমি ভগ্নী, হীরক-উজ্জ্বল এক চন্দ্রের সুষমা—
দীপ্ত উদ্বোধিত ক'রে তুলেছিলে জীবন-হৃদয়।

এখন আর একবার ঊনবিংশ শতকের বিশ্বাসের বিমল জ্যোৎস্নায়
চরিত্র মধুর গাঢ় সমষ্টির আনন্দে উদ্বেল
হ'তে চাই নিবেদিতা, তোমার আত্মার
অমল প্রেরণা পেলে পুনর্বার ফিরে যাবো, দেশ
সজ্ঞ ও সময়জয়ী মনুষ্যত্ব-মণ্ডিত ভুবনে ;
বলিষ্ঠ প্রত্যয়-ভরা, দয়া-ক্ষমা-দীপ্ত মহীয়সী
আমার ভারতবর্ষ, আমার ভারতবর্ষ তুমি নিবেদিতা ॥

লোকমাতা

পিনাকেশ সরকার

প্রসন্ন উপচারে সাজায়ে তুলিয়াছিলে
তমস্বিনী মেদুর অম্বর
অক্ষয় সীমন্তরাগ উপজিল তিলে তিলে
মুছে গেল সুপ্তির প্রহর।

অনন্ত সেবার সুধা এনেছিলে, মহাশ্বেতা নারী,
তৃষাদীর্ণ জাতির অধরে,
মধুপর্ণী স্নেহে তব হেসেছিল জীবনভিখারী
মৃতপ্রায় রিক্ত বালুচরে।
নেপথ্যে ফুটিল সান্দ্র পারিজাত অতন্দ্র কাননে
মৌন মন্দ্রে কাঁপিল উষসী,
আলোর আলেখ্য যেন শিহরিল শিশুর আননে
সৌরভ ছড়াল দশদিশি।

হে জননী স্বাধীশ্বরী, কী আবেগে কোন্ উৎসাহে
জ্বেলেছিলে প্রীতির দীপালি
মরুবালুকার মাঝে পুণ্যতোয়া প্রাণের প্রবাহে
ধন্য আজি তোমার মিতালি।
মোহাঞ্জন মুছে গেছে, আছে তবু পরম প্রমিতি
ক্ষয়শীল বিরুদ্ধ নিখিলে,
সেবার সুবর্ণরেখা রেখে গেছে ভাস্বতী স্মৃতি
এ জীবনে সকল অমিলে॥

অগ্রবরেণ্যা নিবেদিতা

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

ধর্ম এবং রাজনীতি মিলিত যখন দৃঢ়বদ্ধ হাতে হাত,
সেই এক জয়যাত্রা নবসভ্যতার,
সে সঙ্গমে শান্ত সব বিরোধ-তরঙ্গাঘাত অশুভ শক্তির,
চক্র ও চক্রান্ত যত কূট ও কুটিল আন্দোলন—,
তার আগে অনাহত দীপ্তি-শুভ্র বাণী
মহামানবের কণ্ঠে উৎসারিত হবে বহুকাল
উদাসীন শ্মশানের ভস্মরাশি থেকে !
—দ্রষ্টা নিবেদিতা মহামনস্বিনী, বিদ্ধ করেছিল তোমা
দ্বি-ধাগ্রস্ত এ যন্ত্রণা—জীবনযন্ত্রণা।
ধর্ম ও বিজ্ঞান আর সংস্কৃতি ও রাজনীতি
অনড় ব্যক্তিত্ব-দণ্ডে তুলেছিলে জীবনের চতুরঙ্গ পতাকা-স্বরূপ,
পঞ্চমুণ্ডী মহাসন হয়েছিল মানবধর্মের যোগপীঠ,
মা-দুর্গার খাঁড়া দেবভূমি ভারতের মুক্তিযুদ্ধে সন্ত্রাস পিস্তল,
পতিত-পীড়িত জন্যে দুনয়নে প্রেমপ্রীতি করুণা-জাহ্নবী,
ত্রিনয়নে দগ্ধ হত রাজকীয় অত্যাচার-দম্ভের দৌরাত্ম্য।
বিশুদ্ধ-মনন-সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ করেছিলে সংগোপন প্রকাণ্ড হৃদয়—
আত্ম-পরিচয়-লুপ্ত কত তার অলিখিত মস্ত ইতিহাস,
মাঠে-ঘাটে নদীবিলে এগিয়ে দেখালে নিজে
স্বভাবজ সংস্কৃতির কত শত মধুগন্ধ অম্লান পঙ্কজ
সঙ্গীতে সাহিত্যে শিল্পে,—ধূলির করুণা থেকে
এগিয়ে তুললে তুমি নম্র বক্ষে শিরে।
ভারতীয় সভ্যতার নবযাত্রাপথে
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য তুমি একবৃন্তে মিলিয়েছ আপনার ব্যক্তিত্ব-মণ্ডপে;
রুদ্রাক্ষি-শোভনা দেবী, আত্মজয়ী তপস্বিনী
বিবেক-নন্দিনী তুমি, আত্মিক ভগিনী, লোকমাতা !

নিবেদিতা : মা আমার

সরিৎশেখর মজুমদার

তুমি শ্বেতশুভ্র মোমবাতি মধুবর্তিকা,
দক্ষিণেশ্বরের প্রদীপের কাছে
দহনের দীক্ষা নিয়ে
অন্ধকারে আলোক ছড়াতে ছড়াতে
তোমার তিলে তিলে আত্মাহুতি।
তোমার বিবেক-বিগলিত জীবনবোধের কানায় কানায়
টলমল অহেতুকী প্রেম ;
ফোঁটা ফোঁটা তপ্ত অশ্রু,
গলে গলে ঝরে পড়
মোম নয়, শুদ্ধা ভক্তি-মধু।
কবে সে মোম নিঃশেষ,
অথচ তোমার জ্যোতি আজও অনির্বাণ।
কি নামে তোমার পূজা করি ?
দাও, অধিকার দাও, 'মা' বলে ডাকার।

অমর্ত্যের নিবেদন

(লোকমাতাকে নিবেদিত)

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

সূর্যও উত্তপ্ত হয়, দহনও প্রচণ্ড দগ্ধ হয়,
ঈর্ষায় আবেগে স্নেহে কখনও কখনও এই মর্ত্যে
ব্যক্তিত্বের তেজে দীপ্র দেবোত্তর মানবতা দেখে ;

মার্গারেট, তুমি সেই মানবতা ব্যক্তিত্ব দুর্জয়,
তুমি স্থির জয়স্তম্ভ দ্বেষ-দর্প-দম্ভের আবর্তে,
অমর্ত্যের নিবেদন তুমি ধ্রুব মর্ত্যের বিবেকে ;

দেশান্তরে তুমি পাও স্বদেশ, ভারতে এসে পেলে
বুঝি বিশ্বজননীকে, এ দেশ জননী মেনে তুমি
এ দেশের কন্যা হও, মাতা হও একত্রে সবার ;

মায়ের মেয়ের দুঃখে উদ্বেল অপালা তুমি এলে
গার্গী মৈত্রেয়ীর দেশে ;—বদ্ধ ঘরে সমুদ্র মৌসুমী,
সঞ্চারিণী সেবা হলে পথে পথে রুগ্‌ণ কলকাতার ;

চেনালে দেশকে দুঃস্থ নিজাগারে অমূল্য রতন,
দেখালে বাগানে তার ফুল্ল সব বিশ্বের কুসুমই,
বোঝালে দেশকে জানতে বিদেশেরও আছে প্রয়োজন

লৌকিকে বিদেশী তুমি অলৌকিকে তুমি লোকমাতা,
নিবেদিতা, তোমাতেই জানলাম জননী জন্মভূমি,
তুমিই প্রকৃতি, তাই চরিতার্থ পুরুষ-বিধাতা।

হে মহাজীবন, হে মহামরণ

(কাব্যনাট্য)

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

নিবেদিতা ॥ প্রভু, তুমি আবার এসেছো নাকি, অন্ধকারে শিলালিপি রেখে
চ'লে যাবে, ভোর হলে পড়া যাবে ? অগভীর শ্রমণেরা লেখে
যে সব অনুশাসন পড়ে ফের ভুলে যাওয়া যায় ;
তোমার নির্দেশ তবু খররৌদ্রে ঝড়ের হাওয়ায়
মোছে না, আগুনে কই পোড়ে না তো ! শুধু নয় সহজিয়া পাঠ,
প্রতিটি অক্ষর যেন তীরের মতন ঋজু, শাণিত করাত,
নাকি সে ভীষণ খড়গ পুণ্যজননীর কাছ থেকে
পেয়েছিলে ? প্রভু তুমি অন্ধকারে শিলালিপি রেখে
চ'লে যাবে ?
দ্যাখো এই ঘর
জনহীন, দ্যাখো এ নগর
আর জনপদ নয়, আর
ঝর্ণা নিভে গেছে, দীপাধার
ঢালে না শতক্র শিখা, ফুল
ঝরে গিয়ে বাগানে আবার
ফিরে তো আসে না ; যে-অমূল
ফুল ওরা চায়, সে আমার
ফুল নয়, প্রভু, তুমি জানো,
তবে কেড়ে নিলে কেন তরুময় সেই মরূদ্যানও ?

বিবেকানন্দ ॥ হারিয়ে আবার পাওয়া, পরিশেষে আবার হারানো

নিবেদিতা ॥ কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম :
বুদ্ধের মতন অবিকল
হেঁটে গেলে শালবীথিকায়,
সারা বিশ্ব তোমার বল্কল,
বিশ্বের মানুষ রাত্রিযাম
মুছে দেবে ব'লে দীক্ষা চায়।

বিবেকানন্দ ॥ অ-বুদ্ধ ভারতবর্ষ, এখনো অ-বুদ্ধ বিশ্বধাম।

নিবেদিতা ॥ তুমি কিন্তু নির্বাণের থেকে
ফিরে এসে শতাব্দীর মেঘে
তুরুতুরু জয়শঙ্খনাদে
বলে উঠলে, 'মানুষ বানাতে
এসেছি এখানে, শূন্যহাতে
আমাকে ওখানে ফেরাবে কে ?
মানুষ, মানুষ ছাড়া কোনো
মন্ত্র নেই, মানুষেরা শোনো,
বুকে নাও মানুষের ব্রত,
এমন কি মানুষের মতো
পাপ করো, অপরাধ করো
এবং কপট সাধকেরও
ভদ্রতার ছদ্মবেশ ছেঁড়ো।'

বিবেকানন্দ ॥ নূতন পুরুষসূক্ত শুনে তুমি ত্রস্ত হয়েছো তো ?

নিবেদিতা ॥ একবার আমি চম্‌কে উঠেই পরক্ষণে
ফিরেছি তোমার কাছে,
জাতকের মতো :. নশ্বর প্রজাপতির নাচে,
হরিণের ভয়ে, পশুর জঠর পর্যটনে,

পশুর উপরে পাশবিকতর নির্যাতনে
সিদ্ধার্থের মানবমূর্তি দেখেছি আবার নবীন সাজে।
একবার কেন, একাধিকবার
তোমার সমীপে কিছু শিখবার
ইচ্ছা জাগেনি, সব প্রতিবাদ
মুছে ফেলে শেষে প্রতিপদ চাঁদ
সুগণ্ডের মৃদু হাসির মতন তিমির-তোরণে জড়িত আছে।

বিবেকানন্দ ॥ জঙ্গম রুদ্রাক্ষের মতো বিশ্বাস মরে, বিশ্বাস বাঁচে।

নিবেদিতা ॥ মৃত্যু ও প্রেমের মধ্যে কাকে তুমি শ্রেষ্ঠ ব'লে মানো?
আমার দৃষ্টিতে সব মুছে যায়, দু'চোখে বিছানো
মৃত্যু নিয়ে বলো আমি ত্রিজগতে কতদূর যাবো?

বিবেকানন্দ ॥ তোমার আঁধার নিয়ে শত ঋক্-গৈরিক বানাবো।

নিবেদিতা ॥ মৃত্যু ও প্রেমের মধ্যে কাকে তুমি জীবনের ধ্রুব
মনে করো? শুনেছি তোমার ভাষা বারবার, তবুও অশুভ
আমাকে দুর্বল করে, আবার দ্বিগুণ জোরে আমি
প্রতীতির কথা বলি, পুনর্বার দারুণ অনামী
তমিস্রা ঘনায়, আমি মৃত্যু প্রেম দুই দীপ জ্বালি—

বিবেকানন্দ ॥ মৃত্যুতর নয়, প্রেম মৃত্যুর মতন শক্তিশালী।

নিবেদিতা ॥ তুমি কি এখনো আমাদের
হাত ধরে আছো?
বরাভয় পূর্ণিমা চাঁদের
মতো তুমি সর্বত্র বিরাজো?
অথবা বালার্কসম তুমি কি পাতক-পরিত্রাতা?

বিবেকানন্দ ॥ অনাশ্রিত মাটিতেই আমার আসন আছে পাতা।

নিবেদিতা ॥ কতোবার আশ্রয় হারিয়ে
আত্মার গভীর রাত্রি নিয়ে
বাগ্‌দত্ত সতীর্থ ছাড়িয়ে

একাকিনী জীবনে দাঁড়িয়ে
গেয়েছি আমার শোকগাথা,
চেয়ে দেখি এমন সময়
কর্কশ প্রস্তরে রেখে মাথা
'স্বে মহিম্নি' তুমি গাও গান,
'মন চলো নিজ নিকেতনে' ;
নির্বাণ এবং অনির্বাণ·
সেই গানে, সৃষ্টি ও প্রলয়
সে-সংগীতে ওতপ্রোত রয়,
কে তোমাকে শেখালো, বিধাতা ?

বিবেকানন্দ ॥ মৃত্যুরূপা মাতা।

নিবেদিতা ॥ সেই মা তোমাকে আজো নিয়ে যান লোকে লোকান্তরে ?
হে পরিব্রাজক, এই পৃথিবীতে আমাদের ভ্রমণ তোমার
মনে পড়ে ?
তারি মধ্যে কেমন সহজে তুমি ইচ্ছামৃত্যুর জয়টিকা
পেয়েছিলে, মনে আছে? বলো প্রভু সেই আখ্যায়িকা।

বিবেকানন্দ ॥ অমরনাথের গুহা।
অনেক উঁচু নিচুর শেষে অকস্মাৎ
আবির্ভূত ঈশ্বরের মতো
তুষারের শিবলিঙ্গ ঝলে ;
স্বপ্নে মনে হলো কোন্ রাখালেরা কবে
হারানো পশুর পাল খুঁজতে এসে বৈতালিক স্তবে
অর্পিত চিত্র হয়েছিল।
আর আমি সমবেত গ্রাম্য রাখালের মতো একা কেঁদে উঠে
বরফশিবের পায়ে প'ড়ে গেছি, আর দেখি তুহিন-শৃঙ্খল
খুলে ফেলে নটরাজ ছুঁয়েছেন আগ্নেয় মুদ্রায়
আমার শারীরসত্তা,

জটার ভিতর থেকে প্রপাত ঝরিয়ে বলেছেন
'ইচ্ছামৃত্যু নাও, কিংবা, নামান্তরে, ইচ্ছা-অমরতা।'

নিবেদিতা॥ তুমি প্রভু কোন্ বর নিয়েছিলে? বলো তার কথা।

বিবেকানন্দ॥ আমি যেন বারংবার জন্ম নিতে পারি, সেই বর:
আমি যেন জন্মে জন্মে সৈনিক এবং নশ্বর
হতে পারি, সেই বর। নিবেদিতা, তাপসী ক্ষত্রিয়া.
আমাদের এ-গৈরিক যুদ্ধের প্রান্তরে মরমিয়া
মৃত্যুর রুধিরবস্ত্র, মৃত্যুই তো কর্মের মোহানা,
সার্থকতা নয়। ছাখো, তোমার দু'হাত দুই ডানা,
তুমি পূর্ণতার পাখি, অলৌকিক ঈগলের মতো
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত
ভ্রুবলয় দিয়ে আঁকো ভারত-পতাকা কেন্দ্রতলে
বজ্র এক আমাকে জন্মাতে হবে অজস্র অনলে
যারা নিমজ্জিত, শ্লথ, বঞ্চিত এবং অসহায়
আবার তাদের মধ্যে নেমে এসে প্রভাত সন্ধ্যায়
শতকাজ বাকী আছে।
আর নিবেদিতা, তুমি যদি
দূরে স'রে যাও কিংবা এই ব্রতে থাকো নিরবধি,
যদি তপশ্চর্যা রাখো, অথবা বেদান্ত থেকে দূরে
স'রে যেতে থাকো শুধু আপন কান্নায় অন্তঃপুরে,
অন্তিম মৃত্যু পর্যন্ত আমি আছি তোমারি নিকটে,
কুঞ্জরের মুখ থেকে ইভ-দন্ত বহির্মুখী বটে,
কিন্তু তা ফেরে না আর বক্তে্র বিবরে, সেই মতো
মানুষের উচ্চারণ সত্য, শিব এবং শাশ্বত॥